তৃতীয় অধ্যায়

বিমল করের উপন্যাসে জীবনদৃষ্টির বৈচিত্র্য

সাহিত্যিকের প্রতিভা সর্বদাই কোন বিশেষ সাহিত্যধারাকে অবলম্বন করে স্থির হয়ে থাকে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা হয়ে ওঠে বহুমুখী। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সাহিত্যের যে ধারাকে স্পর্শ করেছে সেখানেই ফলেছে সোনা। ঠিক তেমনই আধুনিক যুগের বহু সাহিত্যিক সাহিত্যের একাধিক ধারাকে অবলম্বন করে তাঁদের জীবনদৃষ্টিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ বহু সাহিত্যিক সাহিত্যের একাধিক ধারায় তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।

সাহিত্যিক বিমল করের প্রতিভা প্রাথমিকভাবে ছোটগল্প রচনার মাধ্যমে বিকশিত হলেও, সাহিত্যিক রূপে খ্যাতি পাওয়ার লগ্ন থেকেই তিনি উপন্যাস লেখার ক্ষেত্রেও উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রকাশনীতে চাকরি পাওয়ার আগে দু-একটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন বাণিজ্যিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য। কিন্তু পরবর্তীকালে সাহিত্য রচনার প্রয়াসে তিনি অধিকাংশ উপন্যাস রচনা করেছেন, যেখানে তাঁর জীবন ও জগৎ সম্পর্কে বিশেষ মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে। মানব জীবনের সামগ্রিক রূপ বিস্তৃত পরিসরে প্রকাশ করার স্বার্থে যেমন তিনি উপন্যাস রচনা করেছেন, তেমনি তাঁর জীবনদর্শন প্রকাশের জন্য উপন্যাসে পেয়েছেন বিস্তৃত ক্যানভাস। ছোটগল্পে স্বল্প পরিসরে এবং উপন্যাসে দীর্ঘ পরিসরে তিনি তাঁর বক্তব্য পরিবেশন করেছেন একথা বললেই তাঁর প্রতি সঠিক মূল্যায়ন করা হবে না। কারণ সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে বহুবিধ বিষয় উপস্থাপিত হয়। বিমল করও তাঁর স্বকীয় ভাবনা ছোটগল্প ও উপন্যাস দুটো ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যমন্ডিতভাবে প্রকাশ করেছেন। একারণেই তাঁর জীবনদৃষ্টির আলোচনায় ছোটগল্পের পাশাপাশি কয়েকটি উপন্যাসকে বেছে নেওয়ার প্রয়োজনবোধ করেছি। এর মাধ্যমে তাঁর জীবনদৃষ্টির বৈচিত্র্যকে খুঁজে পাওয়া যাবে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'হ্রদ'--এর মাধ্যমে লেখকের মনস্তাত্ত্বিক ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীকালে এই উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ণও ঘটে। এছাড়াও তিনি 'ঝড় ও শিশির' নামে একটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন যা 'নতুন জীবন' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল। সেই মুহূর্তে দু-তিন কিস্তি রচনার পর অসমাপ্ত থাকা উপন্যাসটি পরবর্তীকালে সংশোধিত রূপে 'বনভূমি' নামে প্রকাশিত হয়।

স্থায়ী চাকুরি লাভ করার আগে বিমল কর বেনারস, আসানসোল কিংবা কলকাতায় অস্থির জীবনাচরণ করেছিলেন। অসহ্য অভাব ও দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করতে করতেও সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ কিছু মাত্রায় কমেনি। ছোটগল্প রচনার পাশাপাশি তাই উপন্যাসও লেখা শুরু করেছিলেন পাঁচের দশকে এসে। সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ, সাহিত্য পাঠের অনুরাগ, মানুষের জীবন ও মনের প্রতি অদম্য কৌতূহল, মানুষের সাথে মেলা-মেশার প্রবণতা তাঁর সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ মাত্রা যোগ করেছিল। মানুষের মনের নানা দ্বন্দ্বমূলকতা ও মনস্তাত্ত্বিকতার নানা নিদর্শন যেমনভাবে তাঁর উপন্যাসের বিষয় হয়ে উঠেছে, তেমনি তার পাশাপাশি লক্ষ্য করা যায় সমকালীন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, মানব জীবনের নানান বৈচিত্র্য, দার্শনিকভাবনা, প্রেমচেতনা, মৃত্যুচেতনা, মানবমনের জটিল গভীর অসুস্থতা, ব্রাত্যভাবনা, প্রকৃতিচেতনা, নৈতিকতা, মানবিকতা প্রভৃতি নানা বিষয়। ছোটগল্পের মতো বিমল করের উপন্যাসেও চেতনা প্রবাহ রীতির মাধ্যমে চরিত্রের কিছু মনোভাবনা প্রকাশ পেয়েছে, যা তাদের অন্তর্জগতের সাথে বাস্তব পরিস্থিতির সম্বন্ধ স্থাপনে কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে। হেনরি জেম্‌স -এর উপন্যাসের ('The turn of the Screw') জীবনদৃষ্টি প্রসঙ্গে যে বক্তব্য তুলে ধরেছেন সমালোচক, বিমল করের উপন্যাসে প্রতিফলিত জীবনদৃষ্টির মূল বক্তব্যের সঙ্গে তার মিল খুঁজে পাওয়া যায়-- "The Point of View is at the center of the Novel. And it must be at the center of any study of the stream of consciousness is the novel; for once we are withen a given mind. In studying the problems of his fixed and varying centers of consciousness ...to record the action of the mind itself." (The psychological Novel, By Leon Edel, J.B.Lippincott Company, New York, Page-57) এই কারণে বিমল করের লেখা উপন্যাসে চেতনা প্রবাহ রীতির মাধ্যমে মনস্তত্ত্বের প্রসঙ্গ এসে পড়েছে।

বিমল কর তাঁর সাহিত্যে তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতি ও ভাবনাকেই প্রকাশ করতে চেয়েছেন। অহেতুক কল্পনাবিলাস তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়নি। একারণে তাঁর রচনায় পল্লীগ্রামের চিত্র তিনি বিশেষ আঁকেননি। সাহিত্যিক হিসেবে তিনি সৎ থাকতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "গ্রামে কখনও থাকা হয়নি। এ জীবন আমাকে নাড়া দেয় ঠিক, কিন্তু অভিজ্ঞতার বাইরে গিয়ে তা নিয়ে লেখার কথা ভাবিনি।"[১] তেমনি তাঁর অভিজ্ঞতার জগৎকে এবং তাঁর জীবনে উপলব্ধ নানা দার্শনিকতাকে তিনি তাঁর উপন্যাসের মাধ্যমে রূপ দিতে চেয়েছেন। একারণে তাঁর উপন্যাসগুলি

যেমনভাবে সময়ের যথার্থ দলিল, তেমনি এর মধ্য দিয়ে তাঁর মানসিকতার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ পায়।

'দেওয়াল' উপন্যাসটি তিনটি পর্বে বিন্যস্ত, 'ছোটঘর'(১৯৫৬), 'ছোটমন'(১৯৫৭) ও 'খোলা জানলা' (১৯৬২)। এই উপন্যাসটিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন প্রায় ১৯৪১ এর মাঝামাঝি থেকে ১৯৪৫ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়কালের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ব্যক্তিজীবনের নানা পরিস্থিতি ও তার মূল্যায়ন প্রকাশ পেয়েছে। এই সময়কালের অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতি, যুদ্ধের প্রভাব, মানুষের অভাব, দারিদ্র্য, মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, মন্বন্তরের চিত্র সব কিছুর মধ্য দিয়ে লেখক তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন বেশ কিছুদিন কলকাতায় অবস্থান করার সুবাদে ও এ.আর.পি --তে কর্মরত অবস্থায় মানুষের প্রকৃত অবস্থা বিমল করের দৃষ্টি এড়ায়নি। এর প্রভাব যেমনভাবে এই উপন্যাসে প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি লেখক এই উপন্যাস লেখার পিছনে আরও একটি উপন্যাস পাঠের প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছেন। বেনারসে থাকাকালীন একটি জার্মান উপন্যাসের অনুবাদ পড়েছিলেন, বইটির নাম 'দি ওয়াল' কিংবা 'এ রুম ইন বার্লিন' এই উপন্যাসে গ্রামের ছিন্নমূল একটি পরিবার বার্লিনে এসে ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে গৃহকর্তার উপলব্ধি হল সকলের বয়স, দেহ, ক্ষুধা, স্বপ্ন, চাহিদা বাড়লেও চারিদিকের দেওয়ালের পরিধি বাড়েনি, বরং কমে গেছে। ধ্বংস হচ্ছে মূল্যবোধ, মানবিকতা। এই উপন্যাসটির প্রভাব বিমল করের মনে ছিল। তিনি বলেছেন--

"-- ওই উপন্যাসটির থিমটি আমাকে খুব স্পর্শ করেছিল। ভাবতাম লেখালেখির চেষ্টা যদি করি কখনো এই রকম একটি উপন্যাস লিখব। বলে রাখা ভাল, তখন আমার কাছে লেখক হবার কোন সুযোগ ছিল না, সাধও নয়, নিতান্তই রেল অফিসের কেরাণিগিরি করে দিন কাটত। মনে মনে শুধু ক্ষোভই জন্মাত, নিজের ব্যর্থতায়।

পরে যখন সত্যি সত্যি কাগজ কলমের কারবারি হলাম --তখন থেকেই আমার মাথায় এই লেখাটির কথা আসত।"[২]

ডি. এম. লাইব্রেরীর প্রকাশক গোপাল দাস মজুমদারের ভরসায় বিমল কর তাঁর 'দেওয়াল' উপন্যাস রচনায় হাত দিলেন বিস্তৃত প্রক্ষাপট নিয়ে। 'ছোটঘর'-- এই পর্বে উপন্যাসে চিত্রিত সময়কাল ১৯৪১ এর মাঝামাঝি থেকে ১৯৪২ এর জুলাই পর্যন্ত। এই পর্বে অঙ্কন করলেন স্বচ্ছলতার অভিপ্রায়ে গ্রাম থেকে কলকাতায় চলে আসা চন্দ্রকান্ত ও তার স্ত্রী রত্নময়ী ও দুই কন্যা

ও এক পুত্রের সংসার। চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত মানুষ, অধ্যয়নই তাঁর একমাত্র ব্রত। এই মানুষটি নিতান্ত অনিচ্ছায় প্রতিবেশী ভ্রাতৃপ্রতিম মোহিতের ভরসায় কলকাতায় চলে এসেছিলেন। মোহিতের বই ব্যবসা ছিল, এবং সে বলেছিল চন্দ্রকান্তর মতো পণ্ডিত মানুষ কলকাতায় এলে যথার্থভাবে সমাদৃত হবেন। কিন্তু কলকাতার ক্রমশ ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ পরিস্থিতি সমস্ত স্বপ্ন ও কামনাকে যেন শুষে নিল। হঠাৎই মারা গেলেন চন্দ্রকান্ত। সংসার যখন অচল হয়ে এল তখনই এই সংসার যুদ্ধে নামতে হল বড় মেয়ে সুধাকে। কারণ তার ভাই বাসু সংসারের বিষয়ে উদাসীন, আড্ডাবাজ এবং পাড়ার বখাটে ছেলের মতো। ঘরে মা, বাসু এবং আরতির প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে সুধাকে চাকরি নিতে হল। আরতি রত্নময়ীর গর্ভস্থ কন্যা নয়, তার মা পার্বতী রত্নময়ীর দূর সম্পর্কের বোন। স্বামীর ঘর থেকে বিতাড়িত হয়ে তিনি রত্নময়ীর বাড়িতে আশ্রয় নেন। তিনি উন্মাদ হয়ে মারা যাওয়ার পর তার মেয়ে আরতি এই সংসারেই সন্তান স্নেহে মানুষ হয়েছিল। সুধার চাকরি করা মা রত্নময়ীর মূল্যবোধে আঘাত করলেও সংসারের প্রয়োজনে সুধাকে পথে নামতে হয়। তার কাছে একান্ত ভরসা ও সান্ত্বনা দিয়েছে অমলা ও সুচারুর মতো সহকর্মীরা। সুচারুর সাথে সুধার ভালবাসার সম্পর্কের সূত্রপাত হলেও তার মধ্যে আসে ব্যাঘাত। সুচারু বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে; যুদ্ধের প্রারম্ভেই বহু মানুষ কলকাতা ছেড়ে গ্রামে ফিরে যাচ্ছে। জীবনের নিরাপত্তা, খাদ্যের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা আজ তাদের কাছে নেই। মানুষ স্বার্থপরের মতো নিজের জীবন বাঁচানোর তাগিদে কলকাতা পরিত্যাগ করে যাচ্ছে। অপর দিকে শুরু হয়ে গেছে মুনাফালোভী, সুযোগ সন্ধানী মানুষদের আগ্রাসী মনোভাব। যুদ্ধকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে আত্ম-সচেতনতা। সুচারু মত প্রকাশ করে, সে যুদ্ধে যাবে। যুদ্ধের মধ্য দিয়ে নতুন দিন, নতুন চেতনা প্রকাশ পাবে বলে তার বিশ্বাস। সুধার অন্তর্নিহিত ভালবাসার চেতনা এই প্রসঙ্গে যেন দুমড়ে মুচড়ে গেছে, তবুও সে বাধা দেয়নি সুচারুকে। তার ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করার প্রতিশ্রুতি জানিয়েছে।

ইতিমধ্যে বাসু সিভিক গার্ড --এ যোগ দিয়েছে, যা সুধার পছন্দ হয়নি। রত্নময়ী বাসুকে নিয়ে মোহিতের শরণাপন্ন হয়েছেন, তাকে কাজের সুযোগ দেওয়ার জন্য। বাসুর সাথে পরিচয় হয়েছে মোহিতের বিধবা কন্যা মীনাক্ষীর। বাসু মীনাক্ষীর প্রতি মুগ্ধ হয়েছে -- একথা জানতে পেরে বাসুকে অপমানিত করেছে মোহিত, এবং এর সূত্র ধরে মীনাক্ষীর হৃদয়-উৎসারিত যন্ত্রণা, তিক্ততা ও

অসুখী মানসিকতা ব্যক্ত হয়েছে। মীনাক্ষীরা যুদ্ধের কারণে কলকাতা পরিত্যাগ করার পর বাসুর জীবনেও নেমে এসেছে হতাশা ও অস্থিরতা।

'ছোটমন' -- 'দেওয়াল' উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্ব। এই পর্বের কাহিনীর সময়কাল ১৯৪২ এর জুলাই থেকে ১৯৪৩ এর শেষ পর্যন্ত প্রায় দেড় বছর। এই পর্বে আরও একটি নতুন পরিবার এসেছে। এই পরিবারে গিরিজাপতি, যিনি 'নিজের কথা' নামের একটি রচনায় হাত দিয়েছেন। এছাড়া তাঁর ভাইপো নিখিল ও ভাইঝি উমা এই পর্বে উপন্যাসে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সুধাদের ভাড়াবাড়িতেই তাঁরা ভাড়া আসায় সুধাদের পারিবারিক অসন্তোষ প্রকাশ্যে এসেছে। এই উপন্যাসের পটভূমিতে রয়েছে তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অস্থিরতার চিত্র, বিশ্বযুদ্ধের করাল গ্রাস, ভারতছাড়ো আন্দোলন, ১৯৪২ এর সামুদ্রিক ঝড় ও বন্যা, এবং ১৯৪৩ এর ভয়াবহ মন্বন্তরের চিত্র। গান্ধীবাদী ভাবনার কিছু সমালোচনা গিরিজাপতির রচনায় ও ভাবনায় প্রকাশিত হয়েছে। এই সকল কারণে 'ছোটমন' পর্বটি এই উপন্যাসের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। এই পর্বে সুধার মানসিক তিক্ততা ও অবসাদ যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি উমার শারীরিক বিকৃতি ও তার প্রতি মানুষের উপহাসে তার হাহাকার ও বেদনাময় অনুভূতিতে করুণ পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এই পর্বে বাসুর ব্যবহার আরও কদর্য রূপ ধারণ করেছে। চাকরি ছেড়ে দিয়ে অর্থিক সমস্যায় পড়ে সে চুরি করা শুরু করেছে। পণ্ডিত ব্যক্তির ছেলে হয়েও তার মূল্যবোধের এই অবক্ষয় তাকে চিন্তিত করেনি। অত্যন্ত বেপরোয়াভাবে সে অপরকে আক্রমণ শুরু করেছে। নৈতিকতাবর্জিত, মূল্যবোধহীন একটি চরিত্র রূপে বাসু এখানে প্রতিভাত।

সুধা চরিত্রটি এই পর্বে ক্রমশ একাকিত্বের যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে শুরু করে। তার চাকরির জন্য মায়ের প্রথমিক বিরোধিতা থাকলেও এখন পরিবারের সকলেই যেন শুধুমাত্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বসে থাকে। প্রতি মুহূর্তে যেন শোষণ করতে থাকে সুধাকে। সুচারু ফিরে আসেনি, যে অন্ততপক্ষে সুধার মানসিক দুঃখ বুঝতে পারতো। আর বাড়ির অপর তিনজন, রত্নময়ী, বাসু ও আরতি তিনটি নিঃসঙ্গ প্রাণীর মতো। প্রত্যেকেই আত্মসচেতন ও স্বার্থপর হয়ে উঠেছে। সুধার মধ্যে দেখা দেয় নস্টালজিয়া। তার বাবা বেঁচে থাকার সময় যে সুখের স্পর্শ ছিল তা তখন আর অবশিষ্ট ছিল না। দিনের প্রবাহের সাথে সাথে সকলের মানসিকতাও যেন ক্রূর, বক্র হয়ে উঠেছে। সে উপলব্ধি করতে পেরেছে অশান্তি এই মুহূর্তে তার সংসারের একমাত্র সুর। প্রত্যেকেই অন্যের কাছ থেকে নিজেকে

গোপন করার চেষ্টা করেছে এবং একা একাই যন্ত্রণা উপভোগ করেছে। অপরের কাছে নিজেকে উন্মুক্ত করে অপরাধ ও গ্লানি প্রকাশ করে সহজ স্বাভাবিক হতে চাইছে না।

এর পাশাপাশি গিরিজাপতির ভাবনাও প্রকাশিত হয়েছে। গিরিজাপতি তাঁর 'নিজের লেখা'য় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রকৃত স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। গান্ধীবাদের মধ্যে বৈপরীত্য তাঁর মনে ধোঁয়াশার সৃষ্টি করেছে। গান্ধী বিশ্বাস করেছিলেন সংগ্রাম ব্যতিরেকে ইংরেজরাই ভারতের মানুষের হাতে স্বাধীনতা তুলে দেবে, আবার পরবর্তীকালে তাঁর মুখেই শোনা যায় স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রামের কথা। এই বিপরীতচারিতা গিরিজাপতির মনে যেমন গান্ধী সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ মানসিকতার জন্ম দিয়েছে; তেমনি কংগ্রেসের অহিংস আন্দোলনেরও তিনি সার্থকতা দেখেন না, কেননা আন্দোলন অহিংসভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। মানুষের মধ্যে জন্ম নেবেই হিংসার বীজ। এছাড়াও তাঁর বিপ্লবী বন্ধু সতীশের বক্তব্য তাঁকে প্রভাবিত করেছে। তমলুকে স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠার ভাবনা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে। সতীশের চোখে একাধারে যন্ত্রণা প্রকাশিত হলেও অন্যদিকে উদ্যমের মধ্যদিয়ে ঈপ্সিত স্বাধীনতা লাভের প্রতিশ্রুতি তাঁর মধ্যে দেখা দিয়েছে। সতীশ বলেছে--

"গিরিজা তুমি গান্ধী ছাড়া কি কিছু জানো না? কংগ্রেস গান্ধীর জমিদারী নয়। কংগ্রেস তাঁর একার নয়। আমাদের -- আমাদের সকলের। সকলের দেশে যা হচ্ছে-- যা করছি আমরা -- ভাল বুঝেই করছি। গান্ধীতে কি আসে যায়। আমাদের নিজের ভাববার করবার অধিকার কেউ নিতে পারেনা।"[৩]

--এই বক্তব্যের মাধ্যমে একনায়কতন্ত্র বা নেতৃত্বকে বরণ করার চেয়ে গণতন্ত্রের সামগ্রিক উদ্যোগকে রূপ দেওয়ার মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে মানুষের স্বপ্ন, সাধ, স্বাধীন দেশের আকাঙ্ক্ষায় সংগ্রামের প্রতিশ্রুতি।

লেখক এই পর্বে যুদ্ধ, ঝড়, মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে মানুষের উদভ্রান্ত পরিস্থিতিকে চিত্রিত করেছেন। প্রথম পর্বে যে মানুষদের কলকাতা পরিত্যাগের চিত্র অঙ্কিত হয়েছিল সেই মানুষেরা আবার ফিরে এসেছে। চারিদিকে বেকারত্ব, অর্থাভাব, খাদ্যাভাব, আন্দোলনকারীদের সংগ্রাম গৃহচ্যুত মানুষদের শান্তি-স্বস্তি দেয়নি। সারা পশ্চিমবঙ্গ তো বটেই বোম্বাই, মাদ্রাজ, আমেদাবাদ, এলাহাবাদ, নাগপুর সর্বত্রই আগষ্ট আন্দোলন, ভারতছাড়ো আন্দোলনের ব্যাপকতা দেখা দিয়েছে। হিংসা-প্রতিহিংসায় মানুষের প্রাণ হয়ে উঠেছে ওষ্ঠাগত। কিন্তু এই সময়কালে জাপানের আক্রমণ, বিধ্বংসী বোমার আস্ফালন কলকাতা শহরকে ভয়ংকর করে তুলেছে। তাই শহরের মানুষ নিরাপদ

আশ্রয়ের অভিলাষে আবার শহর পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মানুষের ভিড়ে ভরে গেছে রেলের কামরা, ছাদ সর্বত্র। প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে সর্বহারা মানুষ। পাঁচদিনের বোমার আক্রমণে কলকাতা শহরের বিপর্যস্ত অবস্থা লেখক অঙ্কন করেছেন।

এর মধ্যে ঘটে গেছে প্রকৃতির পরিহাস-- ভয়ংকর সামুদ্রিক সাইক্লোন। অগণিত মানুষ ও গবাদি পশুর মৃত্যু ঘটলেও সরকার সেই ঘটনার প্রকৃত তথ্য গোপন করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে তার বিধ্বংসী ও ভয়াল রূপের কথা। গৃহহারা মানুষ গৃহের খোঁজে আর্তনাদ করে ওঠে। সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে সৃষ্ট বন্যায় ফসল নষ্ট হওয়ায় সৃষ্টি হয় মন্বন্তরের। মুনাফাবাজ, মজুতদার, সুযোগসন্ধানী মানুষেরা ফসল গোপনে রেখে এই মন্বন্তরের মাত্রাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। কলকাতা শহরে ভরে ওঠে উদ্‌ভ্রান্ত, ক্ষুধার্ত, গৃহহারা গ্রামের মানুষে। নারী পুরুষ, শিশুর আর্তনাদে শহরের রাস্তাও ভরে ওঠে।

"রাস্তার দুপাশ ভরে এই যাযাবর ভিক্ষুকের বিচিত্র উপনিবেশ। কোথাও কাঠ জ্বালিয়ে হাঁড়িতে খুদ ফুটাচ্ছে কেউ, কোথাও কলেরা হওয়া মনুষটা খাবি খেয়ে খেয়ে মরে পড়ে আছে, মাংসের দোকান থেকে কুকুরের সঙ্গে লড়ে খানিকটা ছাল চর্বি হাড় এনে সেঁকছে কেউ বা ছেঁড়া কাগজ সরু সরু কাঠির আগুনে।"[৪]

এই মিছিলে যেমন রয়েছে হরিমতী, হারাণ, নারান, গণি, করিমুদ্দিন, রাবেয়া, জোবেদা তেমনি যশোদার মতো বিধবা মেয়েরা। যাদের স্বপ্নে অপমৃত্যু ঘটে গেছে। নিজের মূল্যবোধ, নারীত্ব, সতীত্বকে অক্ষত রাখবার প্রচেষ্টা করেও ক্ষুধার জ্বালায় সেই চরিত্র নষ্ট হয়ে যায়। এইভাবে শেষ হয়ে যায় পুঁটি, বেরা, হরির বউ, মোক্ষদামণি, বামুনদিদি, তরঙ্গ, আলতা, ছানুরমা, বিন্তির মতো সাধারণ ভদ্র ঘরের মেয়েরা।

সুধা এই সময় চন্দ্রসাহেবের নতুন অফিসে চাকরি করে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাকের আড়ালে সে তার অসুস্থ, বিবর্ণ রূপকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। উমার মনেও গ্লানি, হতাশার উদ্ভব হয়েছে। তার শারীরিক বিকৃতি বাসুর কাছেও বিদ্রূপ লাভ করেছে। সংসারের প্রতি উদাসীন বাসুর বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করলে বাসু তার উত্তরে উমাকে কদর্যভাবে আক্রমণ করেছে। তার বিকৃত শরীরের প্রতি উপহাস করেছে। রত্নমীর মানসিক যন্ত্রণাও অসহনীয় হয়ে উঠেছে এই সময়। আরতির বাবা মারা যাওয়ার পর তার পারলৌকিক কাজের দায়িত্ব আরতিকে গ্রহণ করার জন্য গ্রামের বাড়ি থেকে খবর এসেছে। রত্নময়ী এই খবর গোপনের চেষ্টা করলেও সুধা শেষ পর্যন্ত

সত্য ঘটনা সম্পর্কে আরতিকে ওয়াকিবহাল করার সপক্ষে মত দিয়েছে। কারণ আরতি এই সংসারে পালিতা, সে যাঁদের মা কিংবা বাবা জেনে এসে ছিল, তাঁরা কেউ আপন নয়। এই খবর জানতে পেরে আরতি নিজেকে বিচ্ছিন্ন মানবসত্তা রূপে নিজেকে উপলব্ধি করেছে। বাসু ও আরতি গঙ্গাস্নান করে ফিরে আসার সময় আরতির অশ্রুমোচনে বাসুর বিরক্তি দেখা দিয়েছে। তার কথায় প্রকাশিত হয়েছে দুজনের ভিন্ন পারিবারিক অস্তিত্বের প্রসঙ্গ। আরতিও বুঝতে পারে তার এতদিনের চেনা পরিজনেরা কেমনভাবে পর হয়ে গেছে।

'খোলা জানলা'-- 'দেওয়াল' উপন্যাসের তৃতীয় পর্ব, যার ঘটনাসমূহের সময়কাল ১৯৪৪ এর শুরু থেকে ১৯৪৫ এর জুন মাস পর্যন্ত। এই পর্বে তৎকালীন অস্থির রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির পাশাপাশি চরিত্রগুলির মানসিক ও শারীরিক বেদনাদীর্ণ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এর পাশাপাশি লক্ষিত হয়েছে সকল যন্ত্রণা ও অপূর্ণতা নিয়েও ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা।

আরতির হৃদয়ে অব্যক্ত যন্ত্রণা দিয়ে দ্বিতীয় পর্ব শেষ হয়েছিল, এখানেও সেই ভাবনার রেশ রয়েছে। মা এবং বাবার সত্য পরিচয় যখন সে জেনেছে তখন তার কাছে তাঁরা হয়ে উঠেছেন প্রয়োজনহীন, আবার তার এতদিনের চেনা পালিকা-মা রত্নময়ী মানসিকভাবে দূরে চলে গেছে। এর পাশাপাশি উমা চরিত্রটির করুণ আর্তি প্রকাশ করেছে কলকাতা শহরের অন্তঃসারশূন্যতাকে। তার মনে হয়েছে তার শারীরিক ত্রুটি ছোটবেলার হেতমপুরের মানুষের কাছে উপহাসের বিষয় ছিল না। মানসিক ও সামাজিক সৌহার্দ সেখানে তাকে তৃপ্ত করেছিল, কিন্তু কলকাতা শহরে তার এই বিকৃতি মানুষের কাছে যেন ব্যঙ্গের বস্তু। কলকাতা শহর মানুষের মনের সব সুকুমার প্রবৃত্তিগুলোকে নষ্ট করে দিয়েছে, জীবনের মাধুর্যকে শুষে নিয়েছে। এই হৃদয়হীন, যন্ত্রণাদগ্ধ কলকাতার প্রতি তার ঘৃণা বর্ষিত হয়েছে।

এই মানসিক যন্ত্রণা ব্যক্ত হয়েছে গিরিজাপতির প্রেসে কাজ করা অবনীর মধ্যেও। তার বাবার আত্মহত্যা, মায়ের উন্মাদ দশা পারিবারিক স্থিতাবস্থাকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে দিয়েছিল। এর পরও সে জীবন সংগ্রামে ব্রতী হয়েছে শুধু বেঁচে থাকার জন্যই। সুধার শারীরিক পরিস্থিতি এই পর্বে ভালো নেই সে যক্ষা আক্রান্ত। ডাক্তার বদল করে যেন কোন রকমে ভালো থাকার অক্ষম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সে জানে শারীরিক অসুস্থতা ও মুখের সৌন্দর্যহীনতার কারণে তাকে হয়তো চাকরি হারাতে হবে। অফিসের কাজে সকলের সাথে হাসি বিনিময় করলেও, মনের মধ্যে পুঞ্জীভূত কান্না তার মনে

জীবনের অন্তঃসারশূন্যতার উপলব্ধি জাগায়। অমলা সুধাকে সান্ত্বনা দিয়েছে, জীবনযুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা জুগিয়েছে। সে যেন নিজের ব্যর্থ জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা দিয়ে সুধার জীবনের সাফল্য দেখে তৃপ্তি লাভ করতে চেয়েছে। গিরিজাপতি মনের মধ্যে ধ্রুব, সনাতন, শুভবোধকে আঁকড়ে ধরে থাকার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সুচারু কিংবা অবনীর প্রতিক্রিয়া তাঁকে নাড়া দিয়েছে। তিনি বিগত দিনের কৃতকার্যের জন্য মানসিক পাপবোধ থেকে উদ্ধারের প্রচেষ্টায় সচেতনভাবে শুভবোধ ও সেবা পরায়ণতার আদর্শ গ্রহণ করেছেন। একদিন তিনি সন্ত্রাসবাদী কাজে নিযুক্ত থেকে তাঁর অগ্রজকে হত্যা করেছিলেন। হত্যার পর তাঁর সেই অগ্রজের সমাজ ও দেশের জন্য আত্মত্যাগ ও আত্মবীক্ষাকে উপলব্ধি করে প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য তার স্ত্রী ও দুই পুত্র-কন্যার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। 'নিজের লেখা'য় তিনি আশাবাদী মানসিকতার প্রতিফলন ঘটানোর পাশাপাশি সমকালীন মূল্যবোধের ক্ষয়িষ্ণুতা, অবসাদ, অবিশ্বাসের প্রতিও নজর রেখেছেন।

এই সময় কলকাতার পরিস্থিতির খানিকটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। বোমারু বিমানের ভয়ংকর নির্ঘোষ নেই, দেখা দিয়েছে কর্মসংস্থানের সুযোগ। নতুন অফিস কারখানা সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, মাল সাপ্লাই, কন্ট্রোল, ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট এমনকি মিলিটারিতে কাজের সুযোগ দেখা দিয়েছে। গ্রামের ছিন্নমূল, স্ত্রী-পুত্র হারা অসহায় কিছু কৃষিজীবী মানুষ, যারা কলকাতায় চলে এসেছিল তারা আর গ্রামে ফিরে যায় নি। কারণ জমি বিলিবণ্টনের নিয়মে জমি ফিরে পেলেও জোতদার, জমিদারের পাওনা মেটাতেই সব শেষ হয়ে যাবে। এই ভাবে কৃষিজীবী মানুষের শ্রমিক হয়ে যাওয়ার ছবি রয়েছে। এদের পাশাপাশি কলকাতায় ভিড় করেছে সুবিধেলোভী, অসৎ চরিত্রের দালাল ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। সমকালীন অস্থির পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে তারা ক্রমশ হয়ে উঠেছে পুঁজিপতি।

এই সময় আরতি একটি দোকানে চাকরি পেয়েছে। বাসু বেকারত্বের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে সকলের প্রতিই অবদমিত আক্রোশ প্রকাশ করেছে। ভেবেছে ও যদি মেয়ে হত তাহলেও বোধহয় কাজের অভাব হত না। একদিকে বাড়ির মেয়েদের বিভিন্ন অফিস বা প্রতিষ্ঠানে চাকরির সুযোগ এবং তার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে আকর্ষণ করার ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি অপর দিকে বাসুর মত ছেলেদের বেকারত্ব তৎকালীন মানুষের প্রতিযোগিতার মানসিকতা ও ক্ষয়িষ্ণুতাকে প্রকাশ করেছে।

আরতির সাথে একদিন একটি ছেলেকে দেখে বাসু বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখালে আরতির মন বিষিয়ে ওঠে। আরতির মনে হয় তার সমস্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যেন অপরের কাছে বাঁধা আছে। আরতির সাথে কথা কাটাকাটির জেরে বাসুর মনেও অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। উমার আত্মহত্যার প্রচেষ্টা তার মনে জাগিয়েছে সমবেদনা। সে ক্রমশ সংবেদনশীল মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে। তার যুদ্ধে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা এই হৃদয় বেদনারই চিত্র।

রত্নময়ী সুধা-সুচারুর বিবাহে মত দিলেও সুচারু এখানে একজন বিধ্বস্ত মানুষ রূপে হাজির হয়েছে। যুদ্ধ তার সকল মঙ্গলাকাঙ্ক্ষাকে হত্যা করে তাকে অসহায় নেতিবাদী মানুষে পরিণত করেছে। সুধা সুচারুর এই হতাশাকে প্রশ্রয় দিতে চায়নি। যুদ্ধে একটি হাত খোয়া যাওয়া সুচারুকে নিয়েই সে জীবন যুদ্ধে এগিয়ে যেতে চেয়েছে।

এই পর্বে কমিউনিস্টদের কার্যকলাপ লেখক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। নিখিল এই সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়ে এর মধ্যেকার মানুষদের অবিশ্বাস ও সন্দেহপ্রবণ মানসিকতাকে উপলব্ধি করেছে। এদের চোখে গান্ধী হলেন টাটা বিড়লার এজেন্ট, ব্রিটিশ সরকারের নিলামদার, সুভাষচন্দ্র কুইসলিঙ, এন. এন. রায় ট্রেটার। কমিউনিস্টরা কংগ্রেসের সমালোচনা করলেও সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে খুব বেশি ভরসা পায়নি। তাদের ব্যর্থতাও দেখানো হয়েছে। উপন্যাসের পরিসমাপ্তিতে সুধাকে কেন্দ্র করে সুচারুর মনে ক্ষীণ আশার সঞ্চার হয়েছে। সুধার মাধ্যমে এই সময়ের দার্শনিক প্রত্যয় লেখক বাস্তব সম্মত ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। বিকলাঙ্গ, ক্ষয়িষ্ণু এই জীবনে সর্বাঙ্গ সুন্দর ও সুস্থ কোন কিছু পাওয়া সম্ভব নয়। অপূর্ণাঙ্গ বিষয়ের মধ্যেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে এই জীবনে। নস্টালজিয়ায় আবদ্ধ থেকে পুরোনো দিন, হারানো প্রত্যাশা খুঁজতে না গিয়ে সময়োপযোগী ভাবনায় আকৃষ্ট হয়ে অন্তঃসারশূন্যতার মধ্যেও ফুটিয়ে তুলতে হবে পূর্ণতার কামনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিধ্বংসী রূপ দেশ ও মানুষের উপর কেমন প্রভাব ফেলেছিল, তার পরিচয় রয়েছে 'দেওয়াল' উপন্যাসে। মূল্যবোধের অবক্ষয়, নৈতিকতার পরাজয়, ব্যক্তিসত্তার খণ্ডিত রূপ, মানুষের লোভ, হিংসা, বর্বরতা, রিরংসার রূপ লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। বিশ্বযুদ্ধের সময়কার ব্ল্যাক আউট, জাপানী বোমার আস্ফালন, স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ার, অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ৪২-এর সাইক্লোন ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে সৃষ্ট বন্যা, ৪৩-এর ভয়ংকর দুর্ভিক্ষের চিত্র ও মানুষের প্রকৃত অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় সমৃদ্ধ এই উপন্যাস। সুচারুর মত ভাববাদী মানুষদের পরম সত্যকে লাভ করার বাসনা এবং ব্যর্থতা,

গিরিজাপতির মত মানুষদের পাপস্খলনের প্রয়াস এবং শুভবোধের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, বাসুর মত মানুষদের চারিত্রিক অবক্ষয় ও পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা, সুধার মত মেয়েদের জীবন যুদ্ধ --সব কিছু নিয়ে সামগ্রিক মানবচিত্র অঙ্কন করেছেন লেখক। রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভুল সিদ্ধান্ত, কর্মসূচির অসারত্ব, মানুষের মনে আস্থা জাগানোর ক্ষেত্রে বিফলতা এই উপন্যাসে লেখক দেখিয়েছেন। লেখক বিমল কর নিজেও একসময় র‍্যাডিক্যাল পার্টির সাথে যুক্ত হয়েছিলেন, কিছু সভা সমিতিতেও অংশগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু উৎসাহ লাভ করেননি। তবুও মানবেন্দ্রনাথ রায় ও তাঁর পার্টির প্রতি তাঁর দুর্বলতার কথা তিনি প্রকাশ করেছিলেন।[৫] এই উপন্যাসে বর্ণিত কমিউনিস্ট আন্দোলন সেই ভাবনার পরিচয় বহন করে। গিরিজাপতির চরিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে লেখকের সামনে ছিল তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ একজন মানুষ, তিনি আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসে কর্মরত 'পিয়ারীদা',[৬] যিনি একসময় অনুশীলন দলের সাথে ও পরে কমিউনিস্ট দলে যুক্ত ছিলেন। মধ্যবয়সে এই মানুষটি প্রায় কুড়ি বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। এই মানুষটির জীবনবোধ, মানসিকতা বিমল করের সামনে গিরিজাপতি চরিত্র আঁকতে সাহায্য করেছিল। লেখকের ব্যক্তিজীবনের নানা অভিজ্ঞতা ও জীবনদর্শন এই উপন্যাসে কাহিনী, চরিত্র ও রসপরিণতির মাধ্যমে সার্থক ভাবে ফুটে উঠেছে।

'খড়কুটো' (১৯৬৩) উপন্যাসে ভালবাসার শক্তিকে নির্ভর করে শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেও সুস্থতা ও সুখের অন্বেষণ পরিলক্ষিত হয়েছে। এর পাশাপাশি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসবোধ দুটি চরিত্রের মধ্যে তাদের মানসিক শক্তিকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। অসুস্থতা ও মৃত্যুতাড়িত জীবনেও আশাবাদী মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হওয়া যায় এবং এর সূত্র ধরে ভালবাসা ও বৃহত্তর জীবনের প্রতি অনুরাগী হওয়া যায় তার উদাহরণ এই উপন্যাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ভ্রমর মাতৃহীন হওয়ার পর বাবা আনন্দমোহন হিমানী মা আর কৃষ্ণাকে বাড়িতে নিয়ে আসে। ভ্রমর শারীরিকভাবে অসুস্থ হলেও আনন্দমোহন, হিমানী, কৃষ্ণা কারোর কাছেই সমবেদনা লাভ করে না। আনন্দমোহন কিছুটা উদাসীন, হিমানী নিয়ম কানুনের বাড়াবাড়ি দেখালেও সমবেদনা প্রকাশ করেন না আন্তরিকভাবে, এই অবস্থায় ভ্রমর উপেক্ষা সহ্য করতে করতে তার শারীরিক অসুস্থতাকেও গোপন করতে চেয়েছে। বড়দিনের ছুটিতে অমল তাদের বাড়িতে বেড়াতে এসে ভ্রমরের প্রতি সকলের উপেক্ষা, উপলব্ধি করেছে। কিন্তু এখানে এসে ফুলের মত পবিত্র, সুন্দর ভ্রমরকে তার ভাল লেগেছে। ভ্রমরের অসুস্থতা গোপন করার ইচ্ছাকে সে মেনে নেয়নি। ভ্রমরের প্রায়ই জ্বর হয় তবুও বাঁ পায়ের সামান্য ত্রুটির জন্য ভ্রমর তা অগ্রাহ্য করে ঘুরে বেড়ায়।

অমলের ভালবাসা, সমবেদনা ভ্রমরের উপর বর্ষিত হয়েছে। মেসোমশাই আনন্দমোহনকে এব্যাপারে সচেতন করলেও তেমন আগ্রহ সে আনন্দমোহনের কাছ থেকে লাভ করে না। তার মনে হয় এমনি চললে অকালে হারিয়ে যাবে প্রতিমার মতো সুন্দর, নিষ্কলুষ-- ভ্রমর। কিন্তু ভ্রমর বাঁচতে চায়। তার মা সুখতারার মত মৃত্যুভয়ে সে কাতর হয়ে মৃত্যুকেই সে অভ্যর্থনা জানাবে না, সে মঙ্গলময় ভগবান যিশুর বাণীর মধ্য থেকে ইতিবাচক মানসিকতায় নিজের হৃদয়কে পূর্ণ করতে চায়। এর সাথে যুক্ত হয়েছে অমলের ভালবাসা, সমবেদনা, মমতা বোধের উৎফুল্ল জোয়ার যা তার কাছে একান্ত প্রয়োজনীয় প্রাণপ্রেরণা হয়ে দেখা দিয়েছে। তার মনে হয়েছে ভালবাসার শক্তি অনেক। ভালবাসাই আরোগ্য লাভের একমাত্র উপায়, যিশু অন্ধ কিংবা কুষ্ঠরোগাক্রান্তকেও উদ্ধার করেন ভালবাসার জোরে। তেমনিভাবে ভালবাসার মহান ব্রত আজ সে উপলব্ধি করতে পেরেছে অমলের মধ্যেও। ''ভ্রমর আজ শুয়ে শুয়ে অমলের এই মায়া-মমতা ও করুণার কথা ভাবছিল। মনে হচ্ছিল, এতদিন সে যেন বাইবেলের সেই ডুমুর গাছ হয়ে ছিল। অফলা ডুমুর গাছ। একটি ফল ফলত না কোনদিন। তাকে হিমানী মা'রা হয়ত কেটে ফেলত। কিন্তু অমল এসে তার চারধার খুঁড়ে যেন সার দিয়ে দিয়েছে।''[৭]

ভ্রমর এই সংসারে সকলকেই ভালবাসতে চেয়েছিল, আনন্দমোহন, হিমানী মা, কৃষ্ণা সবাইকে, কিন্তু তার প্রতিদানে সে পেয়েছে দুঃখ, উপেক্ষা। ভ্রমরের মনের অসহায়তা অমলকে কেন্দ্র করে কমে এসেছে। সে আজ ভবিষ্যতে অমলকে নিয়ে অনেক পরিকল্পনা করার মানসিক জোর পায়। অমলের নৈকট্য আজ তার কাছে সকল বাধাকে অতিক্রম করার সাহস যোগায়। এই সময়ে ভ্রমর সাংঘাতিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। ডাক্তার চিকিৎসার জন্য নাগপুরে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন। অনেক ইন্জেকশান, অষুধেও ভ্রমরের উন্নতির লক্ষণ দেখা যায় না, ক্রমশ সে ফ্যাকাশে, বিবর্ণ হয়ে যাতে থাকে। লিউকোমিয়া আক্রান্ত ভ্রমর অমলের সান্নিধ্য লাভ করতে চাইলেও তা সম্ভব হয় না অমলের চোখেও বিচ্ছেদ বেদনা অশ্রুজল নিয়ে আসে, কিন্তু ভ্রমর এখনও আশাবাদী মানসিকতায় আচ্ছন্ন থেকে বাইবেলের লাজারের মৃত্যু ও পুনর্জীবিত হওয়ার গল্প শুনিয়েছে। বিদায় বেলায় অমলের কাছে সে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি জানায়। জীবনের অনেক দুঃখের মধ্যেও আনন্দের প্রতি নিবিষ্ট হওয়ার প্রেরণা জানায়। বাইবেলের বাণী সে ক্রন্দনরত অমলকে শোনায় -- ''তোমার দুঃখ হবে, কিন্তু দুঃখই একদিন আনন্দ হয়ে দেখা দেবে। যীশু

বলেছিলেন, এখন দুঃখ সও, কিন্তু আমি আবার এসে তোমাদের সঙ্গে দেখা করব, তখন সুখী হবে।"[৮] —ভ্রমরের এই আশ্বাসবাণীকে মনে রেখে তার জন্য অপেক্ষায় প্রবৃত্ত হয় অমল।

'খড়কুটো' উপন্যাসে কয়েকটি প্রতীক ও চিত্রকল্পের ব্যবহার লেখকের জীবনদর্শনকে প্রগাঢ় মাত্রা দিয়েছে। খড়কুটো নিয়ে পাখিদের নীড় বাঁধার মধ্য দিয়ে ভ্রমর ও অমলের মত দুটি পাখিরও মনে নীড় বাঁধার স্বপ্ন জাগ্রত হয়। কিন্তু খড়কুটো তো তুচ্ছ জিনিস। বায়ু প্রবাহে হঠাৎই এসে পড়ে, আবার হঠাৎই চলে যায়; তবু এই খড়কুটোই কখনও কখনও মনে আশাবোধের ব্যঞ্জনা দেয়। অমল কিংবা ভ্রমর এই পৃথিবীতে এসেছে, আবার একদিন এখান থেকে চলে যেতে হবে। তাদের এই জীবনেরও কোন স্থিরতা নেই। আয়ুবদ্ধ জীবনে যে কোন সময়ই মৃত্যু তার আগ্রাসী থাবা বসাতে পারে। ক্ষণিক সুখই এখানে তাই হয়ে ওঠে পরম আস্বাদ্য বিষয়। ভ্রমর অমলের মুখের ঘ্রাণ নিতে চায়, কিন্তু অমলের খোলা মুখ তার মুখের সামনে এলে তার হৃদয়ে জেগে ওঠে অনাস্বাদিত অনুভূতি। লেখক তবুও তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে মধ্যবিত্ত মানসিকতার দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে উপস্থাপিত করেন, কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে প্রবাহিত হয় অনন্ত প্রেমের অনুভব।

উপন্যাসের শুরুতে বাজি পোড়ানোর প্রসঙ্গ এসেছে। বাজির ক্ষণস্থায়িত্ব, হঠাৎ আলোর ঝলকানি দিয়ে নিভে যাওয়ার চিত্রের মাধ্যমে লেখক জীবনের সংক্ষিপ্ততা হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে হারিয়ে যাওয়ার স্বাভাবিক প্রবণতাকে উল্লেখ করেছেন। ভ্রমর ও অমলের সম্পর্ক, ভালবাসা, নীড় বাঁধার কামনা এই বাজির আলোর সাথে তুলনীয়। কিন্তু বাজির আলোর সংকেত ও সেই সূত্রে প্রাপ্ত আনন্দধ্বনি যেমন মনে দাগ কেটে যায়, তেমনি ক্ষণিক ভালবাসা, মমতায় ঘেরা আবিষ্ট-মুহূর্ত মনে রেখে যায় চিরকালীন স্মৃতি-- লেখক এই ভাবনাও এখানে ভ্রমর ও অমলের মানসিকতার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন।

উপন্যাসে মিউজিয়ামের প্রসঙ্গ এসেছে, যে মিউজিয়ামের মধ্য দিয়ে মৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায়, স্মৃতিকে ধরে রাখার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। ভ্রমরের অতীতচারিতা, বাল্যস্মৃতির মাধুর্য এক্ষেত্রে উল্লেখ্য। এছাড়াও এর মাধ্যমে অতীতের প্রতি যে দীর্ঘশ্বাস ধ্বনিত হয় তা ভ্রমর ও অমলের বিচ্ছেদ ও স্মৃতিকাতরতায় প্রকাশ পেয়েছে। আনন্দমোহনের নস্টালজিয়ার মধ্য দিয়েও বেদনাবোধ তার হৃদয়কে পূর্ণ করে তোলে।

লেখক বাইবেলের বাণীর মধ্য দিয়ে কিংবা যিশুর মানবিকতার চিত্র দিয়ে এই উপন্যাসে আশাবাদ ধ্বনিত করে তুলেছেন। খ্রীষ্টধর্মের প্রতি লেখকের এই আগ্রহ তাঁর বহু গল্পেও

পরিলক্ষিত হয়। 'মানবপুত্র', বুদবুদ', বরফসাহেবের মেয়ে' প্রভৃতি বহু গল্পে খ্রীষ্টধর্মের উদার বাণীর প্রসঙ্গ লেখক প্রকাশ করেছিলেন। অত্যাচার, অনাচার, অসুস্থতা, দুর্বলতার সময় এই ধর্মের বাণী চরিত্রগুলির কাছে পরম নির্ভরতার ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। বিমল কর তাঁর জীবনেও বেশ কয়েকজন পাদ্রীর সংস্পর্শে এসে এই ধর্মের উদারতার বাণী উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। উদার মানসিকতার সাথে ছোটবেলা থেকে মানুষ হয়ে ধর্মের আচারসর্বস্বতা অপেক্ষা উদার মানবিকতার বাণী তাঁর কাছে গৃহীত মনে হয়েছিল, তাই বার বার তাঁর সাহিত্যে খ্রীষ্টধর্মের কথা ধ্বনিত হয়। ভ্রমর বড়দিনের দিন গেয়েছে, 'হাত ধরে মোরে নিয়ে চলো সখা, আমি যে পথ চিনি না।' -- এই গানে যিশু এবং অমল একই সাথে তার কাছে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি। অমলও নিয়ে এসেছে তার কাছে ভালবাসার মন্ত্র যা তাকে বেঁচে থাকার প্রেবণা জোগায়। মৃত্যুভাবনা এই উপন্যাসে থাকলেও ভ্রমর চরিত্রটি আশাবাদে মুখর। ভালবাসাই তাকে ফিরিয়ে আনবে মৃত্যুর তীর থেকে, এই বিশ্বাস ভ্রমরের মাধ্যমে উপন্যাসে ধ্বনিত হয়েছে।

'পূর্ণ অপূর্ণ' (১৯৬৭) উপন্যাস সম্পর্কে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "মানুষের জীবন অপূর্ণ, স্বাভাবতই তার যাত্রা পূর্ণতার পথে। পরিণত মানুষ কিভাবে সে পথে যাবে? তার জীবনে এত জটিলতা ও মালিন্য এসে গেছে যে তার ফলে জীবনে অবিশ্বাস আর ঘৃণারই প্রাধান্য। ফলে চোখের সামনে ভালবাসাকে ক্ষয় হয়ে যেতে দেখেও মানুষ অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকে। পূর্ণের সন্ধান একালের মানুষকে কে দেবে? বিমল কর তা দিতে চেয়েছেন 'পূর্ণ অপূর্ণ' উপন্যাসে (১৯৬৭)"[৯]

'পূর্ণ অপূর্ণ' উপন্যাসে মানুষের পূর্ণতার অন্বেষণ এবং তার প্রাপ্তিতে আনন্দ এবং অপ্রাপ্তিতে বেদনা অনুভূত হয়েছে। আবার পূর্ণের সংজ্ঞা বা ধারণা মানুষভেদে ভিন্ন হয়ে উঠেছে। আপেক্ষিক এই ধারণার বশবর্তী হয়ে কেউ বা তার সন্ধান পেয়েছে, কেউ বা অসহায়তায় যন্ত্রণার বোঝা সারা জীবন ধরে বয়ে চলেছে। আধুনিক জীবনের নানা অসম্পূর্ণতার মধ্যেই খুঁজে নিতে হয় পূর্ণতাকে। প্রবহমান এই জীবন ধারায় জীবনকে ভালবেসে, কর্মের অঙ্গীকারে নিজেকে আবদ্ধ করে, মনের শুদ্ধ চেতনাকে ধরে রেখে, মানসিক প্রশান্তির মাধ্যমেই এই পূর্ণতার আরাধনা করা সম্ভব। জীবনের তুচ্ছতার মধ্য দিয়েও তাই ফুটে উঠতে পারে পরমপ্রাপ্তির হর্ষ, জীবনের আনন্দ গান। বিমল করের মধ্যেও এই পূর্ণতার প্রতি অন্বেষণ দেখা দিয়েছিল। লেখক বলেছেন, তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ মৃত্যুর ঘটনা, যুদ্ধের সময়কার অসহায়তা বোধ, মানসিক নিঃসঙ্গতা, অসুস্থতার প্রতি

ভয়পীড়িত অবস্থায় তিনি বেঁচে থাকার কারণ ও প্রয়োজনীয়তা বিচার করার চেষ্টা করতেন। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল প্রেম ও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসবোধ, জীবনে ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়েও ইতিবাচক পরিণতির দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা। এই প্রশ্নমূলকতা ও মানসিক উপলব্ধি থেকেই তিনি 'খড়কুটো' উপন্যাস রচনা করেছেন। ''খড়কুটো উপন্যাসের মধ্যে যা ছিল আঁটো সাঁটো গড়নে 'পূর্ণ অপূর্ণ' উপন্যাসে তা আরও বৃহৎ করে প্রকাশ করার চেষ্টাই আমি করেছি। 'পূর্ণ অপূর্ণ' উপন্যাসে আমার একটি অনুসন্ধান আছে। আমি মনে করি, কোন মানুষই জীবনের পূর্ণতা সম্পর্কে ধারণা করতে পারে না। তার অর্থ এই নয় যে, তার সে চেষ্টা বা প্রয়াস থাকবে না।''[১০]

এই প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে উপন্যাসের কয়েকটি চরিত্রের মাধ্যমে। উপন্যাসের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র সুরেশ্বর যে দার্শনিকতায়, জীবনবোধের পরিপূর্ণতায় উদ্বেল, তার সাথে অন্যান্য চরিত্রগুলির যোগাযোগ ঘটেছে, তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, অনেক সময় তার মানসিকতাকে তারা বিরোধিতা করেছে। অবনীও একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র, তার জীবনবোধও স্বতন্ত্র, এবং চরিত্রটির মধ্য দিয়ে অসহায় বেদনাদীর্ণ একটি মানুষের ছবি ক্রমশ প্রকাশিত হয়েছে। সুরেশ্বর লোকালয়-বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ নির্জন জঙ্গলের মধ্যে গুরুডিয়ায় একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিল অন্ধ মানুষদের জন্য। সে সেবার মধ্য দিয়ে জীবনে প্রসন্নতা লাভ করতে চেয়েছিল। অবনীর সুরেশ্বরের এই মানসিকতা পছন্দ হয়নি। তার মনে হয়েছে সেবার নামে সুরেশ্বর আত্মপ্রবঞ্চনার পথ গ্রহণ করেছে। কাহিনীর প্রথমাংশে অবনীর ভারাক্রান্ত হৃদয়ে হাসপাতাল থেকে আসার ছবি বর্ণিত, যেখানে হীরালালের মত সুন্দর যুবকের মৃত্যু তার কাছে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। এই আকস্মিক মৃত্যু জীবনের অনিশ্চয়তার প্রমাণ বলে তার মনে হয়েছে। তার বিচলিত মনের সাথে সুরেশ্বরের অনুভূতির মিল হয়নি। সুরেশ্বর দার্শনিকতা সমৃদ্ধভাবে প্রকাশ করেছে জন্ম ও মৃত্যু প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম, এটা স্বাভাবিক। সুরেশ্বরের বক্তব্য অবনীর কাছে গৃহীত না হলেও সুরেশ্বর জানিয়েছে-- ''আকাশ ও পৃথিবী মানুষের শবাধার। সূর্য চন্দ্র তার শব সয্যার সাজ, নক্ষত্রগুলি আমার গায়ে ছড়িয়ে দেওয়া ফুল। সমস্ত জীব আমার শবযাত্রার সঙ্গী। মৃত্যুর কাছে সকলেই আমাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে।''[১১] সুরেশ্বর মৃত্যু তাড়িত এই জীবনে জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কিত যথার্থ দর্শন প্রকাশ করেছে। জন্মের পর থেকেই মানুষ তার আয়ু খরচ করতে করতে মৃত্যুর সীমায় উপনীত হয়। এই ধারণা তাকে নির্লোভ, নির্বিকার ও অবিচলিত করেছে। তার মনের মধ্যে আবেগের মাত্রা কম। হৈমন্তী, যাকে একদিন দীর্ঘ শুশ্রূষার মধ্য দিয়ে ভাল করে তুলেছিল; চোখের ডাক্তার হয়ে ওঠার

জন্য প্রেরণা যুগিয়েছিল, সেই সুরেশ্বরই হৈমন্তী ডাক্তার হওয়ার পর উচ্ছ্বসিত হয়নি। আশ্রমের কাজে তাকে বহাল করেছে। হৈমন্তী সুরেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও প্রেমে আপ্লুত হলেও সুরেশ্বর আবেগহীন, নির্বিকার। এই কারণে হৈমন্তীর মনে এসেছে হতাশা ও অবসাদ; প্রেমাস্পদের মধ্যে কোন রূপ ইঙ্গিত না দেখে তার মন নির্জন এই আশ্রমে টিকে থাকতে চায়নি। হৈমন্তীর মনে হয়েছে তার অসুস্থতার সময় সুরেশ্বরের যে সান্নিধ্য ও শুশ্রূষা পেয়েছিল, এবং তার ফলে যে আবেগতপ্ত ভালবাসার জন্ম হয়েছিল তা সুরেশ্বরের আশ্রমে এসে বার বার ব্যাহত হয়েছে।

উপন্যাসের অপর উল্লেখযোগ্য চরিত্র অবনী। সে একদিন তার স্ত্রী ললিতার প্রখর ভালবাসায় আবদ্ধ হলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, এবং সম্পর্কের জটিলতার কারণে উভয়ের মনে তীব্র ঘৃণা সঞ্চারিত হয়েছিল। তাদের বিচ্ছেদ ঘটার পর ললিতা তার মেয়ে কুমকুমকে নিজের কাছে রেখে দিলেও তার ভরণ-পোষণের জন্য অবনীর উপর চাপিয়ে দিল আর্থিক দায়। কুমকুমের প্রতি ভালবাসা কোন অংশেই কম ছিল না অবনীর। মেয়ের জন্য তার হৃদয়ের অব্যক্ত ব্যাকুলতা তাকে ক্রমশ যন্ত্রণাবিদ্ধ করেছে। এছাড়াও অবনীর হৃদয়ের ক্ষত তার পারিবারিক সম্পর্কের দিক থেকেও তীব্র হয়ে উঠেছে। তার সঠিক পিতৃ-পরিচয় সে জানতে পারেনি। যে মানুষটাকে সে বাবা বলে জেনে এসেছিল তার সাথে জন্মসূত্রে বন্ধন ছিলনা। অবনী বুঝতে পারেনি সেই মানুষটাকে তার মা কেন দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যেও প্রশ্রয় দিয়ে এসেছিল।

সুরেশ্বরের পারিবারিক সুখ কখনই ছিল না। তার মা ছিল অসুস্থ এবং কিছুটা উন্মাদগ্রস্ত। বাবা অত্যন্ত মন্দ চরিত্রের মানুষ ছিলেন। সুরেশ্বরের মা বেঁচে থাকার সময়ই তিনি অপর একটি বিয়ে করেছিলেন এবং তাকে কলকাতায় রাখতেন। এই মহিলার একটি ছেলে হয় এবং তার বাবার মৃত্যুর পর তারা সম্পত্তির দাবিতে মামলা করতে চায়। সুরেশ্বর সেই বন্ধনও ত্যাগ করে। হৈমন্তীর সাথে পরিচয় হওয়ার পর সুরেশ্বরের সাথে অপর একটি নারীর যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপিত হয় -- সে নির্মলা। নির্মলা সুরেশ্বরের জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। সুরেশ্বর উপলব্ধি করেছে হৈমন্তীর সাথে তার মমতা ও স্নেহের সম্পর্ক থাকলেও যে আনন্দের অন্বেষণ সে করতে চেয়েছিল তা নির্মলার মাধ্যমেই সে উপলব্ধি করতে পেরেছে। নির্মলার অন্তঃকরণের মধ্যেই সুরেশ্বর অনুভব করেছিল তার ঈপ্সিত সৌন্দর্য ও পূর্ণতার দিকচিহ্ন। নির্মলা ধীরে ধীরে অন্ধত্বের শিকার হতে থাকে, সুরেশ্বরের কোন প্রচেষ্টাই তাকে রক্ষা করতে পারে না। কিন্তু নির্মলার দৃষ্টিহীনতা সুরেশ্বরের মধ্যে জ্বালিয়ে দেয় জ্ঞানের আলো। জগৎ সংসারের মানব জীবনের নানা

প্রকার অন্ধত্ব , দৃষ্টিহীনতা সম্পর্কে তার বোধগম্যতা জন্মে। আগুনে পুড়ে নির্মলার মৃত্যু ঘটার পর সুরেশ্বরের মনে এই জীবন সম্পর্কে শূন্যতার উপলব্ধি জাগ্রত হয়। অন্ধ নির্মলার স্মৃতিকে বুকে নিয়ে নির্জন গুরুডিয়ায় আশ্রম নির্মাণ করে সুরেশ্বর। হৈমন্তী ডাক্তার হয়ে এই গুরুডিয়াতে এসে আবিষ্কার করে ক্ষত বিক্ষত, উদাসীন সুরেশ্বরকে, যে সেবার ব্রতকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলে মনে করেছে। সুরেশ্বরের কাছ থেকে অবহেলা পেলেও সুরেশ্বরের প্রতি তার মনে সঞ্চিত ভালবাসাকে সে ক্ষয় করতে চায় না। সুরেশ্বরের অসুস্থতায় সেও সেবা ও শুশ্রূষার মাধ্যমে তার ভালবাসাকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু সুরেশ্বরের বন্ধনহীনতা তাকে গুরুডিয়ার আশ্রমে আর আবদ্ধ রাখেনি। এর পর গুরুডিয়ার আশ্রমের শান্তভাব আর বজায় থাকে নি। মনোহর, তিলুয়া মারা যাওয়ার পর চোখের হাসপাতালও বন্ধ হয়ে যায়। তার বদলে শুরু হয় শহরের ডাক্তার, নার্স, কম্পাউন্ডার, জমাদার, ওষুধ পত্র, ব্লিচিং, ফিনাইল নিয়ে ব্যস্ত হাসপাতাল, যেখানে শান্ত, নিরিবিলি জীবন নেই, আছে দুর্ভাবনা, ভীতি, উদ্বেগ।

গুরুডিয়া ছেড়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার আগে হৈমন্তী তার হৃদয় যন্ত্রণা অবনীর কাছে প্রকাশ করে, অবনী ও ললিতা, কুমকুমকে নিয়ে গড়ে ওঠা জীবনের অসহায়তা তার কাছে ব্যক্ত করে। হৈমন্তী সুমধুর আমন্ত্রণ রেখে যায় অবনীকে উদ্দেশ্য করে। এই পর্বে সুরেশ্বরের মধ্যেও হতাশা ও যন্ত্রণা প্রকট হয়ে উঠেছে, হৈমন্তীর প্রতিও তার সহানুভূতি ব্যক্ত করেছে। সুরেশ্বরের মনে হয়েছে এই জগৎ সংসারে জীবন দুঃখময়-- মানুষ সতত দুঃখী। নিয়তি মানুষের ব্যর্থতার সাথে সংযুক্ত, মানুষের দুঃখ যন্ত্রণার পিছনে নিয়তির প্রভাব সে উপলব্ধি করে। তার জীবনে সে পূর্ণতার সাক্ষাৎ না পেলেও বুঝতে পারে ঈশ্বরই পূর্ণ স্বরূপ। ''মানুষ তার দয়া মায়া, মমতা, প্রেম, শৌর্য, সৌন্দর্য-- সমস্ত কিছুর চরম কল্পনা ঈশ্বরের ওপর আরোপ করেছে; তাই ঈশ্বরের চেয়ে মমতাময় প্রেমময় আর কিছুকে বলি না। অপূর্ণ মানুষের ধারণায় ঈশ্বর তাই পূর্ণ।''[১২]

'সুধাময়' গল্পে সুধাময়ও তার প্রেমের ক্ষেত্রে পূর্ণতার অভিলাষী ছিল। কিন্তু রাজেশ্বরী, হৈমন্তী কারোর কাছ থেকেই সে সামগ্রিক পূর্ণতাকে লাভ করতে পারেনি। সুরেশ্বর ও হৈমন্তীও নির্মলার মাধ্যমে তার পূর্ণতাকে খুঁজতে গিয়েছিল। হৈমন্তীর চেয়েও পূর্ণ মনে হয়েছিল নির্মলা। তবুও সে তার পাশে থাকল না, হারিয়ে গেল। আজ তার হৃদয়ের মধ্যে যন্ত্রণার আবেশঘন অনুভূতি থেকে গেছে। অবনী প্রাথমিক ভাবে সুরেশ্বরকে চিনতে না পারলেও উপন্যাসের শেষাংশে এসে তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছে।

সুরেশ্বরের মাধ্যমে লেখক বুঝিয়েছেন পৃথিবীতে কোন মানুষই পূর্ণ নয়, এর পিছনে তার জীবনে পেয়ে হারানোর দুঃখও কম নয়। সুরেশ্বর মানব জীবনের উপর নিয়তির দুর্লঙ্ঘ্য নিয়মকে উপলব্ধি করেছে, তবুও তারই মধ্য দিয়ে কর্মে আত্মনিয়োগ করে জীবনের সারাৎসার লাভ করতে চেয়েছে। বিমল কর লিখেছেন, ''মানুষের জীবনে কেউ কেউ তার মনোমতন একটি পূর্ণতার সন্ধান করে বেড়াতে পারে, আবার কেউ কেউ মনে করতেও পারে, এ ধরণের অন্বেষণ অর্থহীন, কেননা যথার্থ পূর্ণতা বলে যদি কিছু থাকেও সংসারে--তা অলভ্য। অথচ, এটা আমরা দেখি, পূর্ণতা সম্পর্কে আমরা অবিশ্বাসী হলেও যারা তার সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়--তাদের প্রতি আমাদের কোথায় যেন একটা চাপা সহানুভূতি থেকে যায়।''[১৩] --সুরেশ্বর তার হৃদয়যন্ত্রণার তীব্রতার মধ্য দিয়ে অবনীর সহানুভূতি লাভ করেছে এই উপন্যাসের শেষাংশে।

অবনীর হৃদয়যন্ত্রণা এখানে অত্যন্ত বাস্তবিক। পৈত্রিক সম্পর্ক ও দাম্পত্য জীবন, এই দ্বিমুখী যন্ত্রণার নিরিখে সে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। হৈমন্তী চরিত্রটি প্রথমে সুরেশ্বর ও পরে অবনীর মাধ্যমে জীবনে বাঁচার আনন্দকে উপভোগ করতে চেয়েছে। সুরেশ্বরের মতো মানসিক ভার বহন করে সেবাব্রতের মহিমায় নিজেকে বন্দী করেনি; বৃহত্তর জীবনের প্রতি আস্থা রেখে ভালবাসার মধ্য দিয়ে পুনর্জীবিত হতে চেয়েছে। ললিতা চরিত্রটি আত্মসুখের বাসনায় আবদ্ধ থেকে অবনীর জীবনে ক্ষত সৃষ্টি করেছে। তার শারীরিক উদ্দামতা ভালবাসা সঞ্চারে আগ্রহী নয়, ভোগসুখের চরিতার্থতায় আগ্রহ প্রকাশ করেছে। দাম্পত্য জীবনের মাধ্যমে সুখের ঠিকানা লাভ করেও সে তাকে অবহেলা করেছে। নির্মলার চরিত্রটি তার অন্ধত্ব সম্পর্কে জানলেও জীবনানুরাগ থেকে পিছিয়ে যায়নি। অন্তরদর্শনের মাধ্যমে সুরেশ্বরের ভালবাসা, উদারতাকে অনুভব করে সে বাঁচতে চেয়েছে ঠিকই কিন্তু মৃত্যুবিড়ম্বিত জীবনে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে।

দার্শনিকতা সমৃদ্ধ এই উপন্যাসে লেখক মানুষের ও জগতের পূর্ণতার বিষয়ে অনুসন্ধান করেছেন। নিরন্তর ঘটে চলা ব্যর্থতা, অসহায়তা, বিচ্ছেদ, মৃত্যুর কাহিনী এই উপন্যাসে রূপায়িত হলেও লেখক শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবনবাদী মানসিকতাকে প্রকাশ করেছেন। অপূর্ণাঙ্গতার মধ্য দিয়েও পূর্ণতর জীবনের উদ্দেশ্য ও অনুসন্ধানই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে।

'যদুবংশ' (শারদীয় 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৯৬৭) উপন্যাসে ষাটের দশকের অসুস্থ সামাজিক, রাজনৈতিক ও ব্যক্তিক প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। চার যুবকের আত্মঘাতী ঔদ্ধত্য ও আচরণ সমাজ ও তাদের জীবনকে ক্রমে কলুষিত করে দিচ্ছিল এই চিত্র যেমন লেখক অঙ্কন

করেছেন, তেমনি এর পাশাপাশি যুগের দায়ও অস্বীকার করা যায় না। কারণ এই যুবকদের সৃষ্টি করেছে সেই সমাজ, যে সমাজ অসুস্থ। রচনাটির মাধ্যমে লেখক তাঁর সমাজ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন এবং সমকালীন পরিস্থিতিকেও ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস তাঁর মধ্যে দেখা গেছে। 'পূর্ণ অপূর্ণ' উপন্যাস রচনার বছরই এই রকম একটি উপন্যাস রচনা করে সমকালীন লেখককুল ও পাঠকের কাছে তাঁর বৈচিত্র্যময় স্বাদের সাহিত্য রচনার ক্ষমতাকে তিনি প্রকাশ করেন। কে. সি. দাসের দোকান, কার্জন পার্কে কিংবা ধর্মতলার ট্রামডিপোর ডিফেকটিভ ট্রামে আড্ডা দিতে বসে সমকালীন লেখক শিল্পী বন্ধুদের কাছে তিনি একপ্রকার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন এই রকম একটি উপন্যাস রচনা করবেন বলে।

বিমল কর স্বীকার করেছেন এই উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে তিনি একটি স্প্যানিশ উপন্যাস, গোয়াটেসোলো'র 'দি ইয়াং অ্যাসাসিনস' ও একটি ইটালিয়ান লেখকের উপন্যাস প্রাটোলিনির 'এ হিরো অফ আওয়ার টাইম' --এর প্রভাব অনুভব করেছেন। দীর্ঘদিন আগে পড়া উপন্যাস দুটিতে স্পেন ও ইটালির যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে যে মূল্যবোধের অবক্ষয় ও পীড়িত সমাজসমস্যার রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তার সাথে ষাটের দশকের বাংলার ও ভারতের যুব সম্প্রদায়ের সামঞ্জস্য লেখক খুঁজে পেয়েছেন। বন্ধুদের সাথে আড্ডায় সাহিত্য শিল্পের পাশাপাশি তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিষয়ও বাদ পড়ত না। লেখক তাঁর জীবনে রাজনৈতিক মতাদর্শকে উগ্রভাবে প্রকাশ না করলেও মনের নিভৃত কোণে সচেতন শিল্পী-সাহিত্যিক হিসেবে এই সব বিষয়কে উপেক্ষা করে থাকতে পারেনি।

রাজনৈতিক পরিস্থিতির ফলশ্রুতিতে যে পরিবর্তন ঘনীভূত হয়ে ওঠে তা তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। এই সারিতে আছে ১৯৬৫-তে ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের আন্দোলন, ট্রাম পুড়িয়ে দেওয়ার কর্মসূচীতে পুলিশ-জনতার সংঘর্ষ, ডাক-তার-রেল ধর্মঘট, ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাস জুড়ে খাদ্য আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জনজীবনের প্রভাব, ছাত্রবিক্ষোভ, ১৯৬৭ সালের ২-রা মার্চ পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস জমানার অবসান, ৮-ই মে থেকে নকশালবাড়ি আন্দোলন সারা পশ্চিমবঙ্গ তথা পার্শ্ববর্তী এলাকার উত্তাল হয়ে ওঠার মতো সমকালীন নানা পরিস্থিতি। ছাত্র-যুবকেরা মহত্তর মানবিকতার স্বার্থে বিপ্লবের আঙিনায় এসে ক্রমে ক্রমে হারিয়ে ফেলেছে সুকোমল মানসিকতা, ক্রূর রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাদের জীবনে অভিশাপ

নিয়ে এসেছে। পরিবার সমাজ থেকে উপেক্ষিত যুবসমাজেরা গুন্ডামি, শয়তানির পথ বেছে নিয়েছে। স্বপ্ন হারানো এই যুবকদের প্রকৃত স্বরূপ আঁকার চেষ্টা করেছেন লেখক এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে।

রুচিহীন, নীতি ও বিবেক বর্জিত যুবকদের প্রতিনিধি সূর্য, বুললি, অভয়, কৃপাময়ের মত যুবকেরা, যাদের পারিবারিক দিক দিয়েও শান্তি-স্বস্তি আসেনি, সামাজিক দিক দিয়েও তারা অস্থির সময়ের প্রতিনিধি। সূর্যের সাথে তার দিদি বিজয়ার সম্পর্ক ভাল নয়। বিজয়ার কর্তৃত্ব করার মানসিকতাকে মেনে নিতে পারে না সূর্য। তার বাবা কামাখ্যাবাবু মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, যার ভদ্রলোক বলে সুখ্যাতি নেই। আর্থিক স্বাচ্ছল্য থাকলেও সূর্যের উপর স্নেহ ও ভালবাসার পারিবারিক স্পর্শ আসে নি। শুধুমাত্র রুগ্ন, অসুস্থ ভাগ্নে ছোকনুর প্রতি সে স্নেহশীল, এবং তার দুর্বলতা তার প্রতিই কিছুটা প্রদর্শিত হয়েছে।

বুললির বাবা থানার দারোগা। চাকুরি জীবনের শেষাংশে এসে পড়লেও তিনি বৈধ এবং অবৈধ অর্থপ্রাপ্তির মাধ্যমে পারিবারিক স্বাচ্ছল্যকে সুনিশ্চিত করে ফেলেছেন। ''বুললির বাবা থানার বড় দারোগা, লোকে বলে, যে চেয়ারে বসে -- ওঠবার সময় সেই চেয়ার থেকে পেরেক পর্যন্ত তুলে নেয়, অ্যায়সা চীজ্।''[১৪] বুললির সাথে তার বৌদি মৃদুলার সম্পর্কও ভাল নয়। অত্যন্ত কদর্য ভাষায় তাদের ঝগড়া হতেও দেখা যায়।

কৃপাময় পারিবারিক দিক দিয়ে শান্তি পায়নি। কৃপাময়ের বাবা তার ভাইদের মানুষ করলেও তারা উপযুক্ত হয়ে কৃপাময়ের বাবার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা করে তাকে সরিয়ে ফেলেছে। আঘাতে যন্ত্রণায় কৃপাময়ের মা পাগল হয়ে গেছে। বনেদি বাড়ির ছেলে হয়েও পরিস্থিতির পরিবর্তনে অসুস্থতা, দারিদ্র্য কৃপাময়দের জীবনে নেমে এসেছে। কৃপাময়ের ছোটকাকিমা খানিকটা সহানুভূতিশীল হলেও এই বড়-ঝঞ্ঝায় সেই অবলম্বনও সুখের, শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করতে পারে না। কৃপাময়ের বাবা কিংবা মা এই অবস্থায় প্রতিবাদ করেনি। তার মা ঈশ্বরের চিন্তায়, আশ্রয়ে শান্তি পেতে চাইলেও সন্তানের প্রতি কোন কর্তব্য করেননি।

অপর তিন বন্ধুর মত অভয়ের স্বচ্ছলতা ছিল না। তার বাবার উদয়াস্ত পরিশ্রম, দুজন বিবাহযোগ্যা বোন, মা নিয়ে তাদের অস্বচ্ছল সংসার, তার দাদা বিয়ের পর সংসার থেকে আলাদা হয়ে চাকরি নিয়ে মোগলসরাই চলে গেছে। অভয়ের উপর তাই অনেক দায় বর্তালেও আর্থিক উপার্জনের কোন পথ তার কাছে উন্মুক্ত হয় না। চাকরির জন্য চারুবাবুর দারস্থ হলে চারুবাবু সামান্য সহযোগিতা না করে শুকনো উপদেশ দেওয়ার চেষ্টা করে দায় এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

তত্ত্বকথায় যে পেট ভরে না তা বুঝতে পেরে সূর্য, অভয়ের মত যুবকেরা ক্রমে মানসিক অসুস্থতার শিকার হয়ে পড়ে।

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, প্রশাসন, সমাজের উপর তলার মানুষদের নীতিহীনতা, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতার ছবি অঙ্কন করে লেখক সমকালীন পরিস্থিতিকে স্বচ্ছভাবে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। এর সাথে যুক্ত হয়েছে তুলসীকে কেন্দ্র করে শিল্প-সাহিত্যের অন্তঃসারশূন্যতার দিকটি। তুলসী সূর্যদের বন্ধু হলেও সে কিছুটা শান্ত, উদাস ও রুগ্ন প্রকৃতির যুবক। সে কবিতা লিখত এবং তার দু-একজন কবিবন্ধু ছিল কলকাতায়। তাদের কোন একজন দরিদ্র বন্ধু তুলসীর কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছিল মায়ের অপারেশনের নাম করে তারপর আর সে ধরাছোঁয়া দেয়নি। তুলসীর সরলতার সুযোগ নিয়ে তাকে নিঃস্ব করে তোলে এই যুবকেরা। তুলসী ধার-দেনা করে তার একটা কবিতার বই প্রকাশ করেছিল। এই যুবকেরা খ্যাতিমান কবিরূপে তুলসীকে স্বীকৃতি এনে দেওয়ার জন্য মদের দোকানে তুলসীর বই-প্রকাশকে কেন্দ্র করে উৎসব পালন করেছিল, কিন্তু তুলসীর অবর্তমানে তারাই তুলসীর নামে উপহাস করে ও কদর্য ইঙ্গিত করে। তুলসী এদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পেরে এই জগতের অন্তঃসারশূন্যতা ও কদর্য পঙ্কিলতাকে উপলব্ধি করেছে।

গণনাথ চরিত্রটি আদর্শবাদী চরিত্র, যার বিরুদ্ধে সূর্যরা আক্রমণ শানালেও তিনি তাদের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে জীবনপাত করেছেন। তিনি বয়সের দিক দিয়েও সূর্যদের থেকে বড়। কিন্তু তাঁর উন্নত মানসিকতা সূর্যদের সাথে মিশতে বাধাসৃষ্টি করেনি। সূর্য নিজের খরচ চালানোর জন্য ঘর থেকে 'জন্মসুখী প্রদীপ' চুরি করে আনলে গণনাথ তা বিক্রি হতে দেয়নি, নিজের বন্ধকে রেখে টাকা যুগিয়ে গেছেন ইন্দ্রকে। ভেবেছিলেন পরবর্তীকালে ইন্দ্রের হাত দিয়ে তা তার বাড়িতে পাঠিয়ে দেবেন। উপন্যাসের শুরুতে তাকে কেন্দ্র করে সূর্যদের গালিগালাজ শোনা গেছে। গণনাথ নয়না-যমুনা-রত্নার বাড়িতে ছিলেন। নয়না অশেষ দারিদ্র্য স্বীকার করে ছোট দুই বোনকে মানুষ করার চেষ্টা করেছে। একই শাড়ি ভাগ করে পরা, কিংবা একই চপ্পল দুজনে দু বছর ধরে ভাগাভাগি করে পরার মধ্য দিয়ে তাদের সংসারিক অস্বচ্ছলতার রূপটি প্রকাশিত হয়। গণনাথ নয়নাদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও ভরসা দানকারী মানুষ হয়ে উঠেছেন। আমরা অবশেষে লক্ষ্য করি ইন্দ্রের জন্মসুখী প্রদীপ নয়নাদের ঘর থেকে হারিয়ে গেছে। নয়নার সন্দেহ তার বোন যমুনা সেটা নিয়ে তার মানুষের সাথে ঘর ছেড়ে সুখের সন্ধানে চলে গেছে। কিন্তু সূর্যরা এর জন্য দায়ী করেছে গণনাথকে। তারা তাকে চোর বলেও আখ্যায়িত করেছে। যন্ত্রণায়, দুঃখে হতাশায়

আত্মহত্যা করেছে গণনাথ। কিন্তু এই আত্মহত্যার ঘটনা তাদের অন্তরাত্মাকে প্রশ্নমূলকতার সামনে দাঁড় করিয়েছে, বিবেকবোধকে জাগিয়ে তুলেছে। সুর্যের কথা থেকে তা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান- ''কী লাভ হল তোমার? যে মারবার সে মেরে বেচে দিয়েছে। তুমি শালা মাঝখান থেকে কলা চুষলে। গণাদা, মাইরি গণাদা, আমরা তোমায় মারিনি। মেরেছি? আমাদের জন্য তুমি মরলে? কেন মরলে? মানে লেগেছিল? সম্মানে লেগেছিল? ....তুমি মাইরি আজব মাল।''[১৫]

উপন্যাসটিতে প্রেম ও যৌনতার অস্থির, অসুস্থ চিত্রও প্রকাশিত হয়েছে। সূর্যের সাথে মালার একটা সম্পর্ক তৈরী হলেও সূর্যের দিক থেকে তেমন আগ্রহ দেখা যায়নি। মালা তার শরীর প্রদর্শন করে সূর্যের কাছে কৌতূহল সঞ্চার করতে চেয়েছে। এছাড়াও জয়ন্তী ও মালার মধ্যে গড়ে ওঠা সমকামিতার চিত্র যেমন রয়েছে, তেমনি সুর্য তার দিদির ঘরে অশ্লীল ছবির বই দেখেছে যা মানসিক অসুস্থতার চিত্র। সূর্যের মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে ছোকনুর জন্মরহস্য নিয়েও। অর্থাৎ উপন্যাসটির মাধ্যমে লেখক সামাজিক অসুস্থতার পরিবেশকে চিত্রিত করতে চেয়েছেন। সুর্য, বুললি, কৃপাময়, অভয়, তুলসী, যমুনা, মালা এরা সকলেই সামাজিক ও পারিবারিক কারণে নৈতিকতাহীন বা মূল্যবোধহীন মানুষে পরিণত হয়েছে। ''সূর্য-অভয়-বুললি-কৃপাময় প্রায় সমতুল জীবন পরিধিতে বিচরণ করেছে। এরা সহানুভূতিহীন নয় কিন্তু সংসারের প্রচলিত ছকে আস্থাহীন। ছোটকাকিমার প্রতি কৃপাময়ের শ্রদ্ধা ছিল, ছোকনু সম্পর্কে সূর্যর করুণা ছিল, বৌদির সম্পর্কে বুললির স্বার্থহীন প্রীতি ছিল। তবু সংসারের চার দেওয়াল যেন তাদের আপন ছিল না। আসলে এরা Sick society -তে বাস করে একধরণের দুরারোগ্য Insanity তে ভুগেছে। সংসার এদের দু-মুঠো অন্ন দিলেও সেই অধিকার দেয়নি যাতে এদের বিপন্নতাবোধ এবং 'রাগী তরুণ' হিসেবে অসুস্থ চিন্তা চেতনার মোড় ফিরতে পারে।''[১৬] এদের মধ্যেও স্বপ্ন ছিল, আশা ছিল, কিন্তু সমাজ তাদের সেই প্রত্যাশাকে কোরক অবস্থাতেই নষ্ট করে দিয়েছে। সূর্য বা বুললির বাবা, চারুবাবু, অধ্যাপক, কবি নামধারী শোষক পোকার মতো লোভী মানুষেরা সমাজটাকে নষ্ট করে দিয়েছে, সেই সমাজে কর্মহীন, স্নেহ-মমতাহীন যুবক-যুবতীরা কী পাবে এই সমাজ থেকে। তাদের বীভৎস রূপই সমাজের আসল চেহারা। গণনাথের মতো মানুষেরা একাই গ্রহণ লাগা সমাজকে গ্রহণ-মুক্ত করতে পারেনা। কলঙ্কিত সমাজ থেকে তাদের পিছু হটতে হয়। তাই বলা যায় উপন্যাসটি সমকালীন সমাজের প্রতিফলন। লেখক উপন্যাসটির কাহিনী একটি শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে তুললেও, সেখানকার নাম প্রকাশ করেননি। তৎকালীন সন্ত্রাস ও যুব সম্প্রদায়ের বেপরোয়া মানসিকতা কোন নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ

ছিলনা। কলকাতায় যেমন তা প্রকাশ পেয়েছিল, তেমনিভাবে মফস্বল শহরেও লক্ষ্য করা যায়। এই উপন্যাসের মাধ্যমে তৎকালীন যুগের প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে।

'অসময়' (১৯৭২) উপন্যাসে আত্মকথন রীতির মাধ্যমে লেখক চরিত্রগুলির চারিত্রিক প্রবণতা ও মনস্তাত্ত্বিকতাকে প্রকাশ করেছেন। অশান্ত, ক্ষয়িষ্ণু সময়ে মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও মূল্যবোধের সংঘাত, ইচ্ছা শক্তির উদ্দামতায় ক্ষতবিক্ষত হওয়ার বিষয়টিকে বিমল কর এই উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। উপন্যাসটির ছয়টি চরিত্র মোহিনী, অবিন, আয়না, সুহাস, জ্যাঠামশাই ও শচিপতির মাধ্যমে কথন রীতিকে আশ্রয় করে কাহিনী গড়ে তুলেছেন লেখক। এই উপন্যাসে প্রধান চরিত্র মোহিনী এবং তাকে কেন্দ্র করেই অন্যান্য চরিত্রগুলি আবর্তিত হয়েছে। ছয়টি চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিকতাকে লেখক ফুটিয়ে তুললেও প্রধানত তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন মোহিনী ও অবিন চরিত্রের মনোবিশ্লেষণকে।

মোহিনী চরিত্রটির মাধ্যমে লেখক পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতা, নারীকে পণ্য করে তোলার মানসিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হেনেছেন। মোহিনী প্রথমে শচিপতিকে ভালবেসেছিল। কিন্তু তার বিয়ে হয় রাজেশ্বরের সাথে। বনেদি বাড়ির মেয়ে বনেদি বাড়ির বউ হয়ে গিয়েছিল অনেক আশা নিয়ে, কিন্তু কয়েকদিনের পরই সিঁথি মুছে চলে এসেছিল তার লম্পট স্বামীর সাথে না থাকার প্রতিবাদ জানিয়ে। পিতৃগৃহে ফিরে এসে সংসারের মানুষ হয়ে সব দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল। তার নারীত্বের মাধ্যমে সে সুখী হতে চেয়েছিল। শ্বশুরবাড়ির আবহাওয়া তার কাছে মনে হয়েছিল বিষাক্ত। রূপবান স্বামী দেখে সুখী হলেও সে জানতে পেরেছে তার স্বামী তার সেজ বউদির সাথে অবৈধ সংসর্গে লিপ্ত। মোহিনীকে সে স্ত্রীর মর্যাদা দিলেও সম্পূর্ণ ভালবাসা দিতে পারে না। মোহিনী তার শ্বশুরবাড়ির আর দশটা আসবাবের মত নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে চায়নি।

মোহিনী তার পিতৃগৃহের চেনা পরিমণ্ডলে ফিরে এসেছে, নিজের সকল স্বার্থকে বলি দিয়েছে, নতুনভাবে সম্পর্ক রচনা করে অন্য কারোর সাথে সংসার গড়তে চায়নি। এ তো তার স্বেচ্ছা-নির্বাসন। এইভাবে নিজেকে আত্মপ্রবঞ্চনার করার অর্থ খুঁজে পায়নি অবিন। অবিন তার উচ্ছ্বাস, প্রাণশক্তির জোয়ারে মোহিনীকেও নাড়া দিয়েছে, মোহিনীর স্বেচ্ছা নির্বাসনকে ভেঙে দিতে চেয়েছে। সে সংস্কার বিরোধী, উদ্দাম, পরিবর্তনশীল জগতের সাথে একাত্ম-হৃদয় ও ঝকঝকে পুরুষকারের প্রতিমূর্তি। তার মনে নেই শচিপতির মত মৃত্যুবোধ। জীবনের যৌবনের জয়গান যেন তার একমাত্র

ব্রত। এই অবিন মোহিনীর কাছে ঈপ্সিত, কিন্তু যথেষ্ট রহস্যময়ও। তার এতদিনের দেখা পুরুষদের থেকে অবিন আলাদা-- "শচিদা অক্ষম পুরুষ, তার না আছে সাহস, না তেজ, না উদ্যম। সে সংসারে এসেছে দুর্বলের মতন। ...তাকে দেখে মেয়েদের মায়া হতে পারে, মন ভরে না। আর যে মানুষটার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল তার মতন পুরুষকে আমি কোন দাম দিই না। আর এখন দেখছি এই অবিন ...ওর যেন সবটাই বিচিত্র। তার বেগ আছে নিষ্ঠুরতা নেই। সে দক্ষযজ্ঞ বাঁধানোর মানুষ না। তার মধ্যে যেটা খেয়ালিপনা সেটা ভর করলে তাকে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে বলা মুশকিল, কিন্তু অবিন যখন তার মতি ফিরে পায় তখন সে বড় সুন্দর হয়ে ধরা দেয়।"[১৭] কিন্তু মোহিনী অবিনের কাছেও ধরা দেয় না। সে মনে করে তার জীবনের ছত্রিশটা বছর কেটে গেছে, অনেক দেরি হয়ে গেছে। আর সম্পর্ক বাঁধা যায় না। মোহিনী তার দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাটিয়ে জীবনের প্রয়োজনে নতুন ঘর বাঁধতে না চাইলেও তার মনের অন্তঃপুরে থেকে গেছে হতাশা, যন্ত্রণা, নিসঃঙ্গতা। সে জানে জ্যাঠামশাই কিছুদিন পর এ সংসারের মায়া কাটিয়ে ফেলবেন, আয়নার বিয়ে হয়ে যাবে, সুহাস দূরত্ব বজায় রেখেই চলেছে, "কেউ যদি না থাকে তবে আমি কেন যক্ষের মতন বসে থাকব এখানে। ছত্রিশটা বছর এখানে ঘর বাড়ি বারান্দা করে আমার কতটুকু বুক ভরেছে? কী পেয়েছি আমি? কোন সান্ত্বনায় আঁকড়ে আছি এই মাটি? কী হবে আমার? শুধু বেঁচে থেকে থেকে বুড়ি হয়ে মারা যাব?"[১৮]

মোহিনীর অন্তরের এই প্রশ্ন তাকে তার বর্তমান অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার প্রেরণা দিয়েছে, তবুও সে পারেনি নিজের সংস্কার, রুচিবোধ, মূল্যবোধকে নতুন ভাবনার আলোয় উজ্জ্বল করে তুলতে। ভিতরে ভিতরে সে শুধু ভেঙে গেছে। অবিনের আসার পর সেই ভাঙন আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। তবুও সে উৎসাহ লাভ করতে পারে নি, নিজের মনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য। সমালোচক বলেছেন-- "চলমান জীবনের স্রোত নয়, স্রোত থেকে কিছু মানুষকে আলাদাভাবে সনাক্ত করতে গিয়ে বিমল কর প্রথমেই দেখেছেন মানুষ ভেতরে ভেতরে ভেঙে গেছে এবং সেই ভাঙনের সূত্রেই বার বার প্রবল হয়ে উঠেছে Struggle of the individual; মানুষ যত ভাঙছে, ততই বেড়ে যাচ্ছে তার নিজের সঙ্গে নিজেরই কথা বলার গূঢ় প্রবণতা। ফলে তাঁর উপন্যাসের অনেক খানি the dialogue of the mind itself;"[১৯]

এই মানসিক ভাঙন অন্যান্য চরিত্রগুলির মধ্য দিয়েও লক্ষ্য করা গেছে। শচিপতির বক্তব্যে তার মনের মৃত্যুভয় প্রকাশিত। তাদের পরিবারে একাধারে ঘটে চলা মৃত্যু মিছিল তার মনে

নিয়তির ভয়ঙ্কর খেলার উপলব্ধি জাগ্রত করেছিল, সে তার বাড়ির একমাত্র জীবিত প্রতিনিধি। একসময় সে ভেবেছিল তার জীবনের সাথে মোহিনীকে যুক্ত করে জীবনবোধে উদ্দীপ্ত হতে, কিন্তু তা না ঘটায় তার জীবনের প্রতি অনীহা ক্রমশ কমে হয়ে এসেছে। ধীরে ধীরে সে শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে।

জ্যাঠামশাই তাঁর জীবনে বহু মৃত্যুশোক পেয়েছেন, মোহিনীর পরিণতি তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছে। আয়নার বিয়ে ভেঙে যাওয়া, সুহাসের দূরত্ব বজায় রাখার প্রবণতা, শচিপতির অসুস্থতা, সকল দিক দিয়েই তিনি যন্ত্রণাদগ্ধ হয়েছেন। গ্রহণের পর যে আলোর প্রকাশ ঘটে, সুখ ও আনন্দে ভরে ওঠে এটা মনে করে তিনি শান্তি পাওয়ার চেষ্টা করেছেন।

আয়নার হৃদয়যন্ত্রণাও এখানে প্রকাশিত হয়েছে। তার বিয়ে ভেঙে যাওয়া, সুহাসের বিয়ে না করতে চাওয়া, দিদির নিঃসঙ্গ জীবন তাকে কাতর করে তুলেছে। তপুর সাথে তার অন্তরঙ্গতার ব্যাঘাত ঘটলেও পরবর্তীকালে তা কেটে গেছে, বুলাকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য সুহাসের মানসিকতাকে সে সমর্থন করতে পারেনি।

সুহাস তার দিদির বিবাহিত জীবনের দুঃখজনক পরিণতির জন্য হতাশাবোধ করেছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে আয়নার বিয়ে ভেঙে যাওয়ার যন্ত্রণা। দিদির পরিণতি যে আয়নার ভাবি শ্বশুরবাড়ি ভাল চোখে দেখেনি তা সে বুঝতে পেরেছে, সে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে সমাজের এই সব যুক্তি, বিবেকহীন মানুষদের বিরুদ্ধে, দুঃখে, হতাশায় বুলার সাথে তার যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা ভেঙে দিয়েছে সে। এছাড়া লীলার আত্মহত্যা তার মনে গভীর বিষাদের ছায়া ফেলেছে। পারিবারিক ভাঙন, সম্পর্কের ফাটল, মানসিক অসুস্থতা যে লীলার মৃত্যুর কারণ সে উপলব্ধি করেছে। সুহাসের দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুও তার মনে বিষাদের ছায়া ফেলেছে।

অবিন চরিত্রটি এই উপন্যাসের প্রাণচঞ্চল, প্রত্যয় দীপ্ত চরিত্র। সুহাসদের বাড়ি দেখে তার মনে হয়েছে-- একটা জাদুঘর, যেখানে সর্বত্র প্রাণহীনতার, নিস্তরঙ্গতার ছবি বিদ্যমান। তার মনে হয়েছে সংস্কারের প্রশ্রয় দেওয়ার অর্থ হল মানবিক উল্লাসকে অমর্যাদা করা। সে কারণেই সে মোহিনীদের বাড়ির সংস্কারের অচলায়তনকে ভাঙতে চেয়েছে। মোহিনীর উদাসীনতা তার কাছে আত্মবঞ্চণারই নামান্তর। অদৃষ্টের কাছে সে কোনভাবেই সঁপে দিতে পারে না নিজেকে, এমনকি সে মোহিনীকেও এই পথ থেকে সরিয়ে আনতে চেয়েছে। পারিবারিক বন্ধন যে মোহিনীর বন্দী দশার একমাত্র কারণ তা সে উপলব্ধি করে শ্রদ্ধা, সম্মান, ভালবাসা, বিদ্রূপের মাধ্যমে মোহিনীর সংস্কারের

বন্ধনকে নষ্ট করতে চেয়েছে। জীবনের প্রবাহকে, আনন্দ, উৎসবকে জোর করে ঠেকিয়ে রেখেছে মোহিনী। জীবন পিপাসা ও সত্যের রূপায়ণের মাধ্যমে মোহিনীর মনে আনতে চেয়েছে প্রাণের জোয়ার। একটা সময় অবিন তার প্রাণের উদ্দামতায় মোহিনীর কাছে অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে, কিন্তু মোহিনী তার নিজের অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। কিন্তু অবিনের প্রতি তার ভালবাসাকে সঞ্চারিত করে দেয়।

'অসময়' উপন্যাসে মোহিনীর মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা প্রকট হলেও লেখক অপর চরিত্রগুলির সমস্যাকেও গুরুত্ব দিয়েছেন। মোহিনীর নারীসত্তা স্বেচ্ছাচারী পুরুষদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা করেছে। স্ত্রী হয়ে পরিবারের যূপকাষ্ঠে সে নিজের জীবনকে সঁপে না দিয়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। পারিবারিক বন্ধনের দিক থেকে জ্যাঠামশাই ও অন্যান্য সদস্যদের বন্ধনটিও সুন্দরভাবে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। শচিপতির মৃত্যুবোধ মানুষের জীবনে নিয়তির প্রভাবকে প্রকাশ করেছে। অবিন এর বিপরীত চরিত্র রূপে বদ্ধ, অসুস্থ পরিবার ও সমাজে উন্মুক্ত বাতাস নিয়ে এসেছে। তার কথোপকথনের মাধ্যমেও নানা রূপকার্থ প্রকাশিত হয়। মোহিনী যে ঘরটিতে থাকত, তার জানালা ঘিরে ছিল জামগাছের একটি বিরাট ডাল। এই প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে মোহিনীর দৃষ্টি বাইরের জগতে মুক্তি পেত না। ঝড়ে সেই ডাল ভেঙে পড়ার পর অবিন মোহিনীকে জিজ্ঞাসা করেছে এই আড়াল নিয়ে সে ঘরে থাকত কি করে। এই ডালের আড়ালের রূপকার্থে যেন মোহিনী এই সমাজ থেকে নিজেকে স্বেচ্ছানির্বাসিত করে ঘরের বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছিল। নিজস্ব মূল্যবোধের বেড়া ভেঙে জীবনের প্রয়োজনকে প্রকাশিত হতে দেয়নি। মনে মনে ক্ষয়িষ্ণু হয়ে উঠেছে। গাছের ডাল ভেঙে যাওয়ার পর মুক্তির আবহ এলেও মোহিনী তার বৃত্ত থেকে বেরোতে পারেনি, কিন্তু অবিনের এই প্রসঙ্গ রূপকার্থকে প্রকাশ করেছে সন্দেহ নেই। পরিশেষে বলা যায় 'অসময়' উপন্যাসটি মোহিনীর প্রতিবাদে মুখর হলেও পরিস্থিতির জটিলতায় অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করার একটি প্রয়াস বলে মনে হয়েছে।

'খোয়াই' (১৯৬০) উপন্যাসটিতে অন্ত্যজ শ্রেণীর একজন মানুষের জীবনের ট্র্যাজেডি বর্ণিত হয়েছে। বিমল কর ছোটগল্পে সমাজে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর কিছু চরিত্র অঙ্কন করেছেন; যেমন 'মানবপুত্র' 'আঙুরলতা' 'বুদবুদ' প্রভৃতি। কিন্তু উপন্যাসে তার প্রাচুর্য নেই। 'খোয়াই' উপন্যাসে ফটিক চরিত্রের ঘটনাবহুল জীবনের মর্মান্তিক বেদনাগাথাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। চরিত্রের আত্মকথন রীতির মাধ্যমে উপন্যাসের কাহিনী প্রবল গতিতে এগিয়ে গেছে এবং চরিত্রটির ভ্রাম্যমান জীবনের

নানা ঘটনার মাধ্যমে তার চরিত্রের ও মনের বহু বৈচিত্র্য প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাসের সাতটি অধ্যায়ের প্রতিটি অনুচ্ছেদ সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে। এবং সেইভাবে কাহিনীতে প্রবল গতি আরোপ করতে পেরেছেন লেখক। এই ধরণের পদ্ধতির মাধ্যমে তাঁর প্রথাসিদ্ধ উপন্যাসের গঠন থেকে বেরিয়ে আসার প্রচেষ্টা ছিল বলে লেখক বর্ণনা করেছেন-- ''প্রথাসিদ্ধ উপন্যাস লেখার বাইরে অন্য কিভাবে একটি উপন্যাস লিখতে পারি-- তার চেষ্টা চরিত্র করছিলাম। এ ব্যাপারে সফল হওয়া যাবে কি যাবে না-- তা নিয়ে তেমন ভাবতে বসিনি।''[২০] তবে এই উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে লেখক এরস্কিন কলড্ওয়েলের 'স্যাকরিলেজ অফ অ্যালান কেন্ট' উপন্যাসটির প্রভাব মেনে নিয়েছেন। এই উপন্যাসে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের জীবনযাত্রা বর্ণিত হয়েছিল, যার সাথে 'খোয়াই' উপন্যাসের মিল লক্ষিত হয়।

'খোয়াই' উপন্যাসের নায়ক ফটিকের বিচিত্র জীবনযাত্রার ছবি প্রকাশিত হয়েছে। সে তার বাব-মা কে জানত না। শ্যামলাল বাবুকে বাবা এবং বেশ্যা চাঁপারানিকে মা বলত। তারাই তাকে ছোটবেলায় লেখাপড়া শেখানো শুরু করেছিল, ইজের কিনে দিয়েছিল। এখানে সেখানে ফাইফরমাস খেটে, স্টেশনে কুলি ও কুকুরদের সাথে রাত্রিবাস করতে করতে সেও আর পাঁচটা স্বাভাবিক ছেলের মত মনের নিভৃতে কামনা-বাসনার চাপ অনুভব করতে পারত। তার বন্ধু পার্বতীর সাথে যুক্তি করেছিল অপরের দোকানে ফাইফরমাস না খেটে তারাও একদিন দোকান করবে। পার্বতীর সাথে সে বেশ্যাবাড়িতেও গিয়েছিল, আবার এই পার্বতী একদিন তার সমস্ত জমানো টাকা নিয়ে পালিয়ে গিয়ে ফটিকের জীবনটাকে ঘোর অনিশ্চিয়তার মধ্যে ফেলে দিল। ফটিকও দোকান থেকে টাকা চুরি করে পালাল। এর পর আলুর গুদামে, কাঁচের কারখানায়, মেসের কাজে কিংবা ট্যাক্সি মোছার কাজে নিযুক্ত থেকেছে সে। জীবনযুদ্ধে ব্রতী হয়ে এরপরও তাকে কখনও কাপড়ের ব্যবসা, গেন্জিকলে কাজ, অপেরাতে নিলাম হাঁকার কাজ, গিল্টির গয়নার দোকান দেওয়া, আলুর আড়তদারী করা প্রভৃতি কাজের মধ্য দিয়ে তাকে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হয়েছে। জীবনের অভিজ্ঞতাও ফটিকের কম নয়। সে তার অনিশ্চিত জীবনের মধ্য দিয়েও বুঝতে পেরেছিল কীভাবে বাঁচতে হয়। অস্তিত্বের সংকট যেখানে প্রকট সেখানে অপরকে বঞ্চিত করেই তাকে বাঁচতে হবে। তাই কখনও তাকে আশার মতো বেশ্যাকে খুন করে গয়না নিয়ে পালাতে হয়েছে, কখনও গাড়ি চালাতে গিয়ে মানুষকে চাপা দিয়ে চম্পট দিতে হয়েছে। এই পালানোর ধারা অব্যাহত থেকেছে ভোজবাজি খেলার ওস্তাদ বানোয়ারীলালের সঙ্গ পরিত্যাগ করে গা ঢাকা দেওয়ার মধ্যেও।

ফটিক বুঝেছিল এই পৃথিবীতে একাধিক মানুষ অপর মানুষকে ঠকিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। তার জীবনেও পার্বতী, ময়না কিংবা স্বর্ণ অতিরিক্ত লাভের প্রত্যাশায় তাকে ত্যাগ করে চলে গেছে। সুতরাং জীবন মানেই হলো শুধু চলা-- এগিয়ে যাওয়া। কারোর জন্য অপেক্ষার কোন দাম নেই এই সংসারে। রামেশ্বর ড্রাইভার তাকে বলেছিল, ''দুনিয়া বুঝলি বে উললু-- বিলকুল বি এন আর -এর আপ রোড, গিয়ার চড়িয়ে যাবি, ইন্জিন থামাবি কি শালা চম্পট লাট হয়ে যাবে।''[২১]

জীবনধারণের জন্য ফটিক শুধু ছুটে বেড়িয়েছে। সভ্য সমাজের মানুষের কাছে কোন সাহায্য সহানুভূতি পায়নি, বেঁচে থাকার মতো অনুকূল পরিবেশ পায়নি। অথচ সেও সাধারণ মানুষের মতো স্বপ্ন দেখেছে, প্রবৃত্তির তাড়না অনুভব করেছে। যৌনতার আকাঙ্ক্ষা যেমন তার মধ্যে দেখা গেছে, তেমনি বিবাহিত জীবনের সুখ-ঐশ্বর্য-শান্তিও পেতে চেয়েছে। কিন্তু তার ভাবনার সাথে মেলেনি তার জীবনের গতিপথ। কুমুকে নিয়ে সংসার করার বাসনায় সে কাশীতে যাওয়ার জন্য ট্রেনে চেপেছে, কিন্তু ভুল করে পৌঁচেছে তার ছোটবেলার শহরে। কুমুর সন্তানের মধ্যেও সে সুখ খুঁজে পায়নি। কারণ সে চায়নি তার ও কুমুর সন্তান বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মাক। আলুর আড়ত ছেড়ে তাই একদিন সে আবার পালাতে চেয়েছে। কিন্তু অসুস্থতার জন্য স্টেশনের মুশাফিরখানায় তাকে পড়ে থাকতে হয়েছে। অশেষ দুঃখের মধ্যে সে প্রশ্নাতুর হয়েছে তার সন্তানের বিকলাঙ্গতার জন্য কি তার উচ্ছৃঙ্খল জীবনই শুধু দায়ী। অবশেষে নিজেকে দোষারোপ করে সে ফিরে এসেছে তার স্ত্রী ও পরবর্তী প্রজন্মের কাছে। সংসারের অপূর্ণতা ও অপ্রাপ্তির মধ্যেও সে সুখী থাকতে চেয়েছে, জীবনযুদ্ধে মানবিকতার মাধ্যমে জয়ী হতে চেয়েছে।

ফটিকের জীবনের এই ভাঙাগড়া, শুধু ছুটে চলা, অপরাধ করে পালিয়ে বেড়ানোর মধ্য দিয়েও প্রকাশিত হয়েছে তার হতাশাদীর্ণ দীর্ঘশ্বাস, বেদনার রুদ্ধ অশ্রু। বাঁচার তাগিদে নানা পাপে সে আক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু তার জন্য কোন আত্মদংশন অনুভব করেনি।

গল্পটিতে বাস্তব ও পরাবাস্তবের একত্রে সহাবস্থান লক্ষিত হয়েছে। কামিনী হোটেলে খেতে বসে ফটিক দেখেছে কামিনীর মাথার চুল সব পড়ে গেছে, সারা মাথা সাদা। আবার রাতে বিছানায় ঘুমের মধ্যে তার মনে হয়েছে তার শরীর থেকে সমস্ত হাড় মাংস খুলে পড়ে গেছে। এছাড়া স্বপ্নেও দেখেছে ময়নার মাথার চুল সব পড়ে গেছে। জীবনের ক্ষয়িষ্ণুতা, অন্তঃসারশূন্যতা সে উপলব্ধি করতে পেরেছিল। পূর্বাপর সংহতিবিহীন এই পৃথিবী ও মানুষের জীবনেও কোন সামঞ্জস্য সে খুঁজে পায়নি। তার চোখে দেখা জগত ও অনুভববেদ্য জগতের সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়েই বাস্তব ও

পরাবাস্তবের সহাবস্থান সূচিত হয়েছে। পাপবোধ, যন্ত্রণা, গ্লানি ফটিকের মনকে ছেয়েছিল ঠিকই তবু সে আত্মহত্যায় ব্রতী হয়নি। জীবনের প্রতি অনুরাগে সে জীবনের দাবিকে-ই মেনে নিয়েছে।

একটি ব্যর্থ মানুষের যন্ত্রণাময় জীবনের ছবি বিমল কর তাঁর 'খোয়াই' উপন্যাসের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই ছবি ষাটের দশকের সমাজ ও মানুষের ক্ষয়িষ্ণুতার প্রতিলিপি। যাযাবর জীবনে শিকড়হীন ভাবে ঘুরে বেড়ানো, স্বপ্ন দেখার মানসিকতা, জীবনের ব্যর্থতা ও হতাশায় ভেঙে পড়া, যৌনতা ও হত্যার পিছনে নির্বিকার, আত্মদংশনহীন মানসিকতা প্রদর্শন করার মধ্য দিয়ে তৎকালীন যুগ-জীবনের সম্পর্কে তাঁর ভাবনা লেখক প্রতীকী উপন্যাসের আদলে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

'ভুবনেশ্বরী' (শারদীয় 'দেশ', ১৯৭০) উপন্যাসটি বিমল করের লেখা একটি মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বমূলক উপন্যাস। এই উপন্যাসে চরিত্রের মানসিক যন্ত্রণা ও আত্মিক সংকটকে বিশেষভাবে রূপ দিয়েছেন লেখক। মানুষকে কেন্দ্র করে যদি মিথ্যার মিথ তৈরি হয়, সেই মিথকে সত্যের কুঠারাঘাতেও ভাঙা সম্ভব হয়না --এই ভাবনা 'ভুবনেশ্বরী' উপন্যাসে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

'ভুবনেশ্বরী' উপন্যাসে তিন প্রজন্মের চিন্তা ভাবনা ও তাদের সম্পর্কের টানাপোড়েন প্রকাশ করেছেন লেখক। উপন্যাসের শুরুতে দেখানো হয়েছে একটি নির্জন স্থানে এক প্রজন্মের সদস্যরা খুব বড় বাড়ি তৈরি করেছে, এবং সেই বাড়ি-- 'ভুবন স্মৃতি'র উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে তিন প্রজন্মের সদস্যরা জড়ো হয়েছে। সোমকান্তি বয়স্ক মানুষ, তিনি একাকী দেরাদুনে থাকেন। তাঁর এককালে কেনা জায়গার উপর তাঁর ছেলেরা বাড়ি তৈরি করে তার গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানে তাঁকে ডেকেছে। তাঁর নাতি অমৃত তার মানসলোকের কল্পনার দ্বারা তার দাদুর মা ভুবনেশ্বরীর একটি বড় ছবি এঁকেছে। গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানের সাথে এটাও যথেষ্ট তাৎপর্যবাহী হয়ে উঠেছে।

'ভুবন স্মৃতি' বাড়িটি বিঘে চারেক জমির কিছুটা অংশে গড়ে উঠেছে। বাকি জমিতে নানা ফল ও ফুলের বাগান। একপাশে ভুবনেশ্বরীর স্মৃতিবেদী নির্মিত হয়েছে। এই বিরাট বাড়ি সোমকান্তির ছেলে-মেয়েরা তৈরি করলেও তা তাদের স্থায়ী বসবাসের উদ্দেশ্যে নয়, অবসর যাপনের লক্ষ্যে নির্মিত। তবে তারা আশা করে ছিল সোমকান্তি দেরাদুন ছেড়ে তাঁর মায়ের নামাঙ্কিত এই বাড়িতে থাকতে পারেন। কিন্তু সোমকান্তি অপ্রসন্ন গলায় বলেছেন, ''তোমাদের ভুবন-মা আমারই মা, প্রিয়। মা'র নামে গড়া বাড়িতে থাকলেই কি আমার মা কাছে ফিরে আসবে।''[২২] সোমকান্তির অন্তর্নিহিত হাহাকার এই কথার মাধ্যমে সূক্ষ্মভাবে পরিবেশিত হয়েছে।

সোমকান্তি ভুবনেশ্বরী অপেক্ষা তাঁর মৃতা স্ত্রী হেমমালার স্মৃতিকে সকলের মধ্যে জাগ্রত করতে চেয়েছেন। কিন্তু সোমকান্তির সকল ছেলে-বউমা, মেয়ে-জামাই, নাতি-নাতনি ভুবনমায়ের স্মৃতিমণ্ডপ ঘিরে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করতে চেয়েছে, স্মরণ করতে চেয়েছে তাঁর অপূর্ব কিংবদন্তিকে। তাদের দ্বারা সোমকান্তি অনুরুদ্ধ হয়েছেন তাঁর ভুবন মা সম্পর্কে স্মৃতি তর্পণের জন্য। সোমকান্তি তাঁর ঘরে সকলকে ডেকে নিয়ে ভুবনেশ্বরী সম্পর্কে তাঁর সত্যভাষণ দিতে চেয়েছেন, এবং প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছেন মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধাচরণের মধ্য দিয়ে। তাঁর মনে হয়েছে উত্তরপুরুষদের কাছে আসল সত্য উদ্‌ঘাটিত হওয়া উচিত, কারণ ভুবন-মাকে নিয়ে প্রচলিত গল্পকথা অসহ্য ও মিথ্যা এই মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে সোমকান্তির আত্মিক সংকট ধরা পড়েছে। তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে ধরা পড়েছে যন্ত্রণা ও হতাশার পরিচয়। ‘‘তোমরা এমন করে একটা ভুবন-মা গড়ে নিয়েছ। দোষ তোমাদের নয় বাবা, দোষ আমার, আমার পাপ আমায় তোমরা স্বীকার করে যেতে দাও’’[২৩]

সোমকান্তির সত্যবচনে প্রকাশিত হয়েছে, তাঁর মা সুন্দরী ছিলেন না কিন্তু তাঁর শরীরে একটা টান ছিল। তিনি দয়ালু ছিলেন না। পাখি কিনতে গিয়ে তিনি বুড়ো পাখিওলাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিলেন। বাবার মৃত্যু সম্পর্কে সোমকান্তি রহস্য অনুভব করেন। তাঁর বাবার চোখে তিনি জল দেখতে পেতেন। তিনি আগুনে পুড়ে মারা গিয়েছিলেন। সোমকান্তির মনে হয়, ‘‘সংসারে শুধু একই রকম আগুনে মানুষ পুড়ে মরে না, নানা রকম আগুন আছে। কে বলবে কোন আগুনে আমার বাবা পুড়ে মরেছিলেন।’’[২৪] বাবার মৃত্যুর পর ভুবন-মা রানিপুরে একটি বাড়িতে অসুস্থ রোগীর সেবায় নিযুক্ত থাকার সময় গয়না চুরির দায়ে বহিষ্কৃত হন। কিন্তু অসুস্থ রোগীর স্বামী মেজোবাবুর সাথে তাঁর মায়ের অবৈধ সম্পর্ক ছিল বলে সোমকান্তির মনে হয়েছে। ‘‘মেজোবাবুর হাত ছিল চুরিতে। মেজোবাবু স্ত্রীর চোখের আড়ালে আরও অনেক কিছু চুরি করত মা’র কাছ থেকে।’’[২৫] এর পর কাশীতে আসার পর তাঁর মা কয়েকদিনের মধ্যে তাঁর নিজের ব্যবস্থা পাকা করে ফেলে ছিলেন। হোটেল ম্যানেজার চক্রবর্তী মশাইয়ের সাথে তাঁর সম্পর্ক হয়েছিল। একদিন তেরো চৌদ্দ বছরের ছেলে সোমকান্তিকে অনাথ করে তাঁর মা পালিয়ে গিয়েছিলেন। রাস্তা-ঘাট-স্টেশনে থাকতে থাকতে একদিন একজন সরল ভদ্র মানুষের মমতার ছায়ায় আতিথ্য পেয়েছিলেন সোমকান্তি। তাঁর কাছে নিজের বংশগৌরব ও পারিবারিক মানুষদের উচ্চ মানসিকতার গল্প বলে তাঁর করুণা আদায় করেন। এমন কি একদিন তাঁর মেয়ে হেমমালাকে স্ত্রী রূপে লাভ করেন।

হেমমালাও মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তাঁর মৃতা শাশুড়ি- ঠাকরুনের দেবী সুলভ মহনীয়তার কথা জেনে গিয়েছিলেন।

সোমকান্তি তাঁর এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে নিজের হৃদয় উৎসারিত বেদনাকে প্রকাশ করেছেন, নিরুপায় নিরাশ্রয় একটি কিশোরের আত্মযন্ত্রণার রূপরেখা অঙ্কন করেছেন। তাঁর স্বীকারোক্তির মাধ্যমে নিজের মিথ্যাচারের বিষয়ে যেমন গ্লানি অনুভূত হয়েছে, তেমনি ফেলে আসা জীবনে উপেক্ষা, বঞ্চনার জন্য আপশোস এসেছে। ''যখন নিজেকে বাঁচাবার দরকার হয়, মানুষ কী না করে!''[২৬]

সোমকান্তির এই স্বীকারোক্তি কারোর কাছেই গ্রহণীয় হয়নি। মেয়ে তপতী কেঁদেছে, অন্যান্যরা তীব্রভাবে প্রতিবাদী হয়েছে। নাতি অমৃত সকাল বেলা ছুরি এনে তার নিজের হাতে আঁকা ভুবনেশ্বরীর ছবিটিকে ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েও পারেনি। তার মনে হয়েছে তার দাদু সোমকান্তি ভুল বলেছে, এই ছবিটিই সত্যি। সোমকান্তি অব্যক্ত যন্ত্রণাকে ব্যক্ত করে সত্য প্রকাশের মাধ্যমে যে স্বস্তির সন্ধান করেছিলেন, তা তিনি পাননি। ''সোমকান্তির এখন মনে হচ্ছিল, তিনি নিশ্চয়ই উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন, নয়ত কেন তিনি এমন করে সব ভাঙতে গেলেন! কী পেলেন তিনি? কোন লাভ হল তাঁর? কিছুই তো হল না। তিনি শান্তি পেলেন না, স্বস্তি পেলেন না, তাঁর স্বীকারোক্তি তো কই তাঁর হৃদয়কে ধুয়ে মুছে নির্মল করে দিল না। তিনি কি বিন্দুমাত্র সান্ত্বনা পাচ্ছেন কোথাও? তবে?''[২৭]

একদিনের সকাল থেকে পরের দিনের সকাল এই স্বল্প সময়ের ঘটনা নিয়ে উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে। ঘটনার থেকেও প্রাধান্য পেয়েছে মনস্তাত্ত্বিকতা, প্রাধান্য পেয়েছে আত্মিক বিশ্লেষণ। অন্তর্জগতের রহস্য উদ্‌ঘাটনকারী লেখক বিমল কর চরিত্রের মানসিক দ্বন্দ্ব ও মনের গভীর সমস্যাকেই তাঁর সাহিত্যে রূপায়িত করতে চেয়েছেন। এখানে তিন প্রজন্মের মিলনমেলায় যে চরিত্রভিত্তিক টানাপোড়েনের ছবি অঙ্কন করেছেন তা আধুনিক সাহিত্যের বিশেষ দিক। এই উপন্যাসে মানুষের মনে জাগ্রত হওয়া মানুষ সম্পর্কে যে মিথের প্রসঙ্গ রয়েছে তা বাইরের ঝঞ্ঝা দিয়ে ভাঙা সম্ভব হয়নি। দীর্ঘ দিন লালিত সংস্কারকে যেমন ভাঙা যায় না, তেমনি মনের মণি কোঠায় প্রতিষ্ঠিত মানব সম্পর্কে কিংবদন্তিও চিরস্থায়ী -- লেখক এই ভাবনা উপন্যাসে সঞ্চারিত করেছেন। বিমল করের 'জননী' গল্পের সাথে এই উপন্যাসের ভাবনাগত সামান্য মিল লক্ষিত হয়েছে একটি যায়গায়, সেটি হল, মৃতার প্রতি সম্মান জানানোর প্রচেষ্টা রয়েছে দুটি ক্ষেত্রেই।

তবুও বলতে হয় বিষয়বস্তুগত ভাবনা দুটি ক্ষেত্রে এক নয়। 'জননী'তে সন্তানেরা মায়ের মূল্যায়ন করে তার প্রতি নিজেদের সম্মান জ্ঞাপন করেছে এবং মায়ের পূর্ণতা কামনা করেছে, আর 'ভুবনেশ্বরী'তে তৈরি হওয়া মিথের প্রতি সম্মান জানানোর ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। এখানে সব সত্য নয়, তবু মানসিক বিশ্বাসের ফলে তা ধ্রুব ও চিরন্তনতার মর্যাদা পেয়েছে। তবে পূর্বপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণের মাধ্যমে দুটি রচনাই বিশেষত্ব পেয়েছে।

'নিমফুলের গন্ধ' (১৯৮৫) উপন্যাসটি সহজ সরল ভাষায় স্বল্প দৈর্ঘের কাহিনীকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। নামকরা সুগন্ধি ফুল ছেড়ে নিমফুলের গন্ধের প্রসঙ্গ এসেছে উপন্যাসে, যে গন্ধ পছন্দ করে আনন্দ, মণিমালা, হয়ত পছন্দ করত মণিমালার দাদা। জীবনের অনেক তিক্ততার মধ্যেও সুখের সন্ধানের ইঙ্গিত এর মাধ্যমে প্রকাশিত। কঠিন বাস্তবের পরাক্রমের পরেও জেগে থাকে সামান্য স্বপ্ন, যা নষ্ট হওয়ার নয়, তাকে ইঙ্গিত করেই নিমফুলের গন্ধ তাৎপর্যবাহী হয়ে ওঠে।

উপন্যাসটি শুরুতে, শেষে এবং মাঝে মাঝেও মৃত্যুর খবর ও স্মৃতি একটা 'Morbid' আবহাওয়া সঞ্চারিত করেছে। পাড়ার নির্ঝঞ্ঝাট, শান্ত মানুষ শান্তিময় ভাদুড়ির আত্মহত্যার ঘটনার প্রসঙ্গ দিয়ে উপন্যাসের সূচনা। সেই সূত্র ধরে এসেছে মণিমালার গৃহশিক্ষক তনুদা'র আত্মহত্যার স্মৃতি। বৌদি বিজয়ার স্মৃতিতে এসেছে তার স্বামীর মৃত্যুর প্রসঙ্গ। মণিমালার অতীতচারিতায় জেগে উঠেছে তার মা ও বাবার মৃত্যু। এত গুলো মৃত্যুর পরে উপন্যাসের শেষাংশে মণিমালা আত্মহত্যা করতে চেয়েছে। মৃত্যুর এত প্রসঙ্গের পাশেও জীবনানুরাগের কথা ধ্বনিত হয়েছে। মনের অগোচরে বয়ে চলেছে নীরব প্রেমের বার্তা।

আনন্দ এবং মণিমালার জীবন কঠিন বাস্তবের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। আনন্দর বাবা খুব বড় উকিল ছিলেন, কিন্তু হঠাৎই ভাগ্যের ফেরে তাদের জীবনে নেমে আসে অনিশ্চয়তার মেঘ। অশেষ দারিদ্র্য সহ্য করে আনন্দ এখন একটা ছাপাখানা চালায়-- 'লোটাস প্রেস'। মূলধনের অভাবে তাও বন্ধ হওয়ার মুখে। কিন্তু আনন্দ নামটির সাথে তার ব্যবহারের বেশ মিল রয়েছে। নিজের বাড়ি নেই, দিনু ও তার বউ পারুলের সাথে আধা-আধি ভাগ করে মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নিয়েছে সে ভাড়া বাড়িতে। তবুও খুশি ও আনন্দ প্রকাশে তার কোন কমতি নেই। দায়ে দরকারে মণিমালার কাছে হাত পাততে তার কোন সংকোচ হয় না, সর্বদা সকলের সাথে মজা করে কথা বলে সে। জীবনটাকে যেন সে লঘু করে নিয়েছে। মণিমালার যন্ত্রণাময় জীবনে সে যেন কিছুটা প্রাণবায়ু

সঞ্চারিত করে দেয়। রোগ, ক্লান্তি, দারিদ্র্য সব কিছুকেই উপেক্ষা করে সে প্রাণোচ্ছলতায় পরিপূর্ণ চল্লিশ ছুঁই ছুঁই বিগত-যৌবন প্রেমিক যুবক। তার প্রেমের স্বীকারোক্তি ধ্বনিময় হয়ে ওঠেনি। তবু তা প্রকাশিত হয়েছে সাহায্য, সহানুভূতি, অনুকম্পা ও যন্ত্রণাময় কিন্তু হাস্য প্রদর্শনকারী মুখের মধ্য দিয়ে। ''রোগা ফরসা, গালভাঙা ওই মানুষটার দিকে তাকালে বোঝাই যায় না, প্রায় অকেজো একটা ফুসফুস নিয়েও বেঁচে আছে। অকেজো ফুসফুস, ভাঙা হাত। বাঁ হাতের কনুয়ের কাছটায় ধনুকের মতো বাঁকা আনন্দের। পায়ে বন্দুকের গুলি ও খেয়েছিল একবার। ওকে দেখে এসব ধরা যায় না। অদ্ভুত ছেলে। ওর চেহারার মধ্যে বুদ্ধির কোন ছাপ নেই, চোখের জ্বলজ্বলে ভাবটা সারল্যের, অফুরন্ত জীবনীশক্তির।''[২৮]

মণিমালার বয়সও প্রায় আনন্দের কাছাকাছি। বাবা, মা মারা যাওয়ার পর প্রায় দশ বছরের বড় দাদার কাছে মানুষ হচ্ছিল সে। হঠাৎ দেওয়ালির রাতে আগুন লেগে দাদা মারা যাওয়ায় চরম অনিশ্চয়তা নেমে আসে তাদের পরিবারে। দু বছরের মেয়ে বৌদিকে রেখে দাদার মৃত্যু তার কাছে ভয়াবহ রূপ নিয়ে এসেছিল। বৌদির পাশে দাঁড়িয়ে জীবনযুদ্ধে ব্রতী হয়ে অবশেষে যখন খানিকটা থিতু হল ততদিনে যৌবন অস্তামিত। আনন্দকে তার ভাল লাগলেও জীবনে বিবাহের সম্ভাবনা আজ আর তাকে আকুল করে তোলে না। একটা চাকরি নিয়ে জীবনটাকে সে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করেছে। তবুও তার মনে নেমে আসে অনিশ্চয়তার যন্ত্রণা। বৌদি বিজয়ার সাথে তার ঝগড়া হয়েছে ঘর সারানোর অজুহাতে। এই সূত্রে মণিমালা উপলব্ধি করে এই বাড়িতে তার কোন অধিকার নেই। দাদার মৃত্যুর পর ভার রয়েছে বৌদির উপর, এরপর ভাইঝি টুনুর বিয়ের পর টুনু এবং জামাইর। এই সংসারে সে বাড়তি মানুষ। তার কোন প্রয়োজন নেই এখানে থাকার। এই বাড়ির ইট, কাঠ, বাগানের পেয়ারা, বাতাবি লেবুর গাছ সব কিছুর সাথে তার চেতনা ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল, কিন্তু সেই বন্ধন আজ তার কাছে বোধ হয় নষ্ট হয়ে গেছে বৌদির কর্তৃত্বের কাছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে অতীতচারিতার মাধ্যমে সে তার জীবনের সুখস্মৃতির কথা, বাবা, মা, দাদার কথা ভাবতে থাকে, হয়ত শান্তি পাওয়ার চেষ্টা করে, কেননা বাস্তব জগতে তার শান্তি কোথায় কবে যেন সে হারিয়ে ফেলেছে। আনন্দও তার কাছে আসে, কিন্তু দরকার পড়লে। তবুও তার আসার পর যেন খানিকটা জীবনীশক্তি তার মনের মধ্যে প্রবেশ করে।

বৌদি বিজয়ার সাথে মনোমালিন্য হওয়ার পর মনটা তার ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে। বৌদি তার কাছে একদিন অভিভাবিকার মতই ছিল। কিন্তু আজ সে আবিষ্কার করে টুনু বড় হওয়ার পর

থেকে বৌদির সমস্ত জগৎ টুনুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। মণিমালার সাথে সংসারের বিষয়ে আলোচনা করে ঠিকই, কিন্তু মণিমালার মনে হয় বৌদি যেন তার সিদ্ধান্তটা শুধু শুনিয়ে দেয়। বাড়ি মেরামতের জন্য নিজের সিদ্ধান্তকেই গুরুত্ব দেয়। মণিমালার ইচ্ছের পরোয়া করে না, আর্থিক সাহায্যও চায় না। টাকার প্রয়োজনে গমকলওলা কৈলাসের কাছে হাত পাতে। মণিমালার মনের মধ্যে এই উপেক্ষা যন্ত্রণার সৃষ্টি করে। আনন্দকে সে জানায়, ''না টুনু আমার নয়। তার মায়ের। ...আমার নিজের কিছু নেই, বাড়ি নয়, ঘর নয়, টুনু নয়। ওরা ধীরে ধীরে আমার সব কেড়ে নিয়েছে। আমি একলা। আমার নিজের কিছু নেই।''[২৯] --এই একাকিত্ববোধ, সকলের থেকে বিচ্ছিন্নতার ভাবনা তাকে কাতর করেছে। সংসারের স্বার্থপরতার ছবি আজ যেন সে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছে। এই সমস্যা যেন মণিমালাকে ছাপিয়ে আধুনিক বিশ্বের ব্যক্তিসত্তার সমস্যা হয়ে উঠেছে। আনন্দের সামনে সে নিজের হৃদয়ের যন্ত্রণার কথা প্রকাশ করে ঠিকই, কিন্তু তার মনে হয় আনন্দ আজ তার প্রতি ছদ্ম-সহানুভূতি দেখাতে এসেছে, আসলে তার উদ্দেশ্য বৌদির হয়ে ওকালতি করা। মণিমালার অন্তরসত্তা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। তার অস্তিত্বের সংকট তার মনে সঞ্চারিত করেছে দুর্ভাবনা। বয়স্ক, বিগত-যৌবনা, আইবুড়ো একটি মেয়ের কাছে ভবিষ্যৎটা অত্যন্ত অনিশ্চয়তার ভাব নিয়ে উদিত হয়েছে। মণিমালা নিজের অস্তিত্বের তাগিদে লড়াই করতে চেয়েছে, আবার দুঃখে যন্ত্রণায় আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে।

বিজয়ার মনের ক্ষতও কম নয়। খুব অল্প বয়সেই স্বামীর আকস্মিক মৃত্যু তার মনে দুঃখ হতাশার জন্ম দিয়েছে। নিজের মেয়েকে ঘিরে আজ যা কিছু স্বপ্ন অবশিষ্ট আছে তা নিয়েই সে বেঁচে থাকতে চেয়েছে। মণিমালার সাথে তার একটা ইগো-সমস্যা দেখা দিয়েছে। স্বামীর মৃত্যুর পর বয়সে ছোট ঠাকুরঝি মণিমালাকে নিয়ে কোন রকমে উঠে দাঁড়িয়েছে তারা। তার নিজস্ব চিন্তা ভাবনার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে মণিমালাকে হয়ত উপেক্ষাই করতে চেয়েছে সে। কেননা এই সংসার তার। সামাজিক প্রথা অনুযায়ী স্বামীর পর তারই কর্তৃত্ব এখানে বলবৎ হওয়া উচিৎ। তার মেয়ের ভাল-মন্দ তাকেই দেখতে হবে। কিন্তু মণিমালা যখন তার নিজের পয়সায় বাড়ির একটা অংশ সারাতে চেয়েছে, তখন বিজয়ার আত্মসম্মানে তা আঘাত করেছে। এই বাড়ির মেয়ে হিসেবে মণিমালার যে অধিকার আছে তা বিজয়ার কাছে স্বীকৃত হয়নি।

উপন্যাসটিতে প্রেমের কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হয়নি। তার অনুভব যেন ছড়িয়ে আছে নিমফুলের মৃদু গন্ধের মতো। মণিমালা ও আনন্দ একে অপরকে তুই-তুই করে কথা বলে,

আনন্দ মণিমালাকে ইয়ারকি করে পিসি বলে ডাকে, এর মধ্য দিয়ে তাদের বাল্য জীবন থেকে সৃষ্ট হওয়া অনুরাগ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের নিবিড়তা সূচিত হয়। একের প্রতি অন্যের অনুকম্পাও আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। উপন্যাসের শেষে অস্থির মানসিকতার আতিশয্যে মণিমালা আত্মহত্যার প্রসঙ্গ তার মুখে উত্থাপন করলে আনন্দ শিহরিত হয়েছে। তার বন্ধু রজনী একদিন আনন্দের কাছে একটা পিস্তল, কিছুটাকা এবং ছোট শিশিতে বিষ রেখেছিল রাজপুত ও হরিজন সংঘর্ষের সময়। আনন্দ তা গচ্ছিত রেখেছিল মণিমালার কাছে। সেই বিষ আজ মণিমালার কাছে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। আনন্দ মণিমালার হাত শক্ত করে ধরে তা ফেরত দেওয়ার জন্য অনুনয় করে। কিন্তু মণিমালার জেদের কাছে পরাভব মেনে নিবিড় ভালবাসার আনুকূল্যে বেঁধে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করে। মানব মানবীর চরিত্রের অন্তঃনিসৃত প্রেমের ছবিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এই উপন্যাস।

'নিমফুলের গন্ধ' উপন্যাসটিতে জীবন-মৃত্যুর নানা সমস্যা ফুটে উঠেছে। জীবন এখানে যেমন হতাশাব্যাঞ্জক, অনিশ্চিত, তেমনি মৃত্যুও রহস্যময়। মানুষের মৃত্যুর কারণ, আত্মঘাতী মানুষও সঠিকভাবে ব্যক্ত করতে পারবে না। তবুও জীবন-ছুট এই মানুষেরা রহস্যময়তাকেই মানুষের সামনে প্রকাশ করে। বাইরে থেকে একটি মানুষকে অপর মানুষেরা বিচার করে, কিন্তু তার মনের গভীরে ঘটে চলা ভাঙনের খবর কেউ রাখে না-- সম্ভব নয় বলেই। ''বাইরে থেকে দেখলে জীবনের অনেক কিছুই মনে হয় শান্তি। যে মানুষটা চলে গেল তার কাছ থেকে তো শোনা যাবে না--সে যাবার সময় শান্তি নিয়ে গিয়েছিল, না অপমান গ্লানি আর শুধু কষ্ট নিয়েই।''[৩০] তেমনি ভাবে মৃত্যুর কারণ জানা যায় না তনুদা'র আত্মহত্যা ক্ষেত্রেও। মৃত্যুর এই বীভৎসতার পাশাপাশি আনন্দর জীবনবোধ, বেঁচে থাকার তৃষ্ণা আশ্চর্য নিপুণতায় বর্ণিত হয়েছে। ফুসফুসের রোগ, শারীরিক ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়েও সে বেঁচে থাকতে চেয়েছে। পরিহাসের মধ্য দিয়ে বর্ণনা করলেও তার বক্তব্য অনেক বেশি ইতিবাচক-- ''চল্লিশের আগেই ফক্কা হয়ে গেলে ব্যাপারটা খুব খারাপ হবে। ...পরমায়ুর ব্যাপারে তাদের পারিবারিক দৌড় মোটামুটি পঞ্চাশ ছাড়িয়েই খানিকটা, তার আগে যাবার ব্যাপার নেই। তবে আনন্দর বেলায় আগেভাগে হলে সে বংশের নাম ডোবাবে।''[৩১] জীবনতৃষ্ণায় উদ্বুদ্ধ আনন্দ শুধু নিজের ক্ষেত্রে নয় মণিমালাকেও বাঁচাতে চেয়েছে। প্রেমের নিঃশব্দ অঙ্গীকারে বাঁধতে চেয়েছে তার হৃদয়।

প্রতিদিনের তুচ্ছ ঘটনা , তিক্ততা, হৃদয়ভার এই সমস্ত ছবির পাশাপাশি লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন ভালবাসার অমোঘ সত্যকে। প্রতিদিনের ঘটে চলা দুর্ঘটনা, বিশ্বাসের অপমৃত্যু,

অনিশ্চয়তার বোধ মানুষকে যে ভাঙনের দিকে এগিয়ে দিয়েছে, পঙ্কিলতার আবর্তে আটকে দিচ্ছে তার সত্তা, সেখান থেকে জীবনবোধে উদ্দীপ্ত মানসিকতা ঝড়ঝঞ্ঝাকে অতিক্রম করে এগিয়ে যায় ভবিষ্যতের দিকে। ভঙ্গুর এই পৃথিবীতে ভগ্ন আশা, স্বপ্নের হাত ধরেও সাধ্যানুগ ভাল জীবনের সন্ধান করে পোড় খাওয়া, হতাশা দগ্ধ মানুষেরা, আপোষ করে বাঁচতে চায় জীবন প্রবাহে --এরই ছবি 'নিমফুলের গন্ধ' উপন্যাসটিতে ব্যক্ত হয়েছে।

'বেদনা পর্ব' (১৯৮৭) উপন্যাসেও চরিত্রগুলির মধ্যে একাকিত্ব, বিষণ্নতা, বেদনাবোধ প্রকাশিত হয়েছে। বসুদা, রাণু, বিবি কিংবা শচীনবাবুর মত চরিত্রে মানসিক যন্ত্রণার স্বরূপ এই উপন্যাসের মাধ্যমে লেখক দেখিয়েছেন। শচীনবাবুর যন্ত্রণার স্বরূপ অন্যান্য চরিত্রের কথোপকথনে প্রকাশিত, কারণ এই উপন্যাসে শচীনবাবুর আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। শচীনবাবুর এই মৃত্যু অন্যান্য চরিত্রগুলিকে প্রভাবিত করেছে; চরিত্রগুলি আত্মসমীক্ষার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে।

বসুধার জন্মদিনে তার বাল্যজীবনের সঙ্গিনী, তার বাবার বন্ধুর মেয়ে রাণুর পাঠানো একটি প্যাকেট ও চিঠি নিয়ে আসছিলেন রাণুর মামা শচীনবাবু। বসুধার জন্মদিনেই তাঁর মৃত্যু ঘটল -- এই বিষয়টি বসুধাকে আলোড়িত করেছে। এই ঘটনা সূত্রে বেনারস থেকে রাণু কলকাতায় চলে এসেছে। এই মৃত্যু তাকে গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছে। টি. বি. রোগে একসময় আক্রান্ত হয়েছে রাণু, পারিবারিক জীবনের গভীর শোক, অসুস্থতা, মানসিক হাহাকার সব কিছু নিয়ে সে ভাল নেই। যেমনভাবে ভাল ছিল না শচীন মামা। রাণু বর্ণনা করেছে। শচীন মামা উদার, সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি বিয়ে করেছিলেন অত্যন্ত ধনী পরিবারের সুন্দরী এক মেয়েকে, তার পায়ের একটু খুঁত ছিল ঠিকই, কিন্তু শচীনমামা অষ্টমঙ্গলায় তার শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে একাকীই ফিরে এসেছিলেন, তার পিছনে ছিল অন্য খুঁত। বসুধা শচীনবাবুর বন্ধু কিরণবাবুর মুখ থেকে শুনতে পেয়েছে, শচীনবাবুর বিবাহিতা স্ত্রীর একটি দশ বারো মাসের সন্তান ছিল। তারা তাঁকে সত্য গোপন করে বিয়ে দিয়েছিল। মানুষের প্রতি মানুষের এই ধাপ্পাবাজি, জুয়াচুরি সহ্য করতে না পেরে শচীনবাবুর মা পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। আর নিরুপদ্রব, সরল, সাদাসিধে মানুষটি নিজেকে শুধু সরিয়ে এনেছিলেন নিঃসঙ্গতার মধ্যে।

বিবি চরিত্রটির বেদনাবোধও কম নয়। সে বসুধাকে জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানালেও নিজের মনের সংগোপনে যন্ত্রণার বীজ পুষে রেখেছে। সুখী দাম্পত্যের স্বপ্ন নিয়ে সে শ্বশুর বাড়িতে সংসার

করতে গিয়েছিল, কিন্তু অচিরেই ফিরে এসেছে। দু-আড়াই বছরের সংসারে সে বুঝেছে শ্বশুরবাড়ির সকলের নোংরা কদর্য মানসিকতা। তাদের অনেক পাপের কথা ও জানত বলে তারা তাকে গাড়ি চাপা দিয়ে মারতেও চেয়েছিল। বিবি তার লোভী, কামুক, নোংরা চরিত্রের স্বামীর সাথে থাকতে পারেনি, চলে এসেছে। তার সমস্ত ক্ষোভ সঞ্চারিত হয়েছে পুরুষদের উপর। ''বারো আনা পুরুষ মানুষের কাছে মেয়েরা নেসেসিটি, তাদের পার্ট অফ লাইফ নয়। মুখে যে যাই বলুক আমরা তোমাদের গোলাম!''[৩২] --তাই সে আর অন্য পুরুষের সাথে সম্পর্ক রাখতে চায়না। নিজের সম্ভ্রম, নারীত্ব, স্বাধীনতার প্রতি বিশ্বাস, নিজের ব্যক্তিত্বের উপরে বিশ্বাস রেখে অন্তরের বেদনাবোধকে সঙ্গী করেও জীবনসংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

রাণুর মনের বেদনাবোধ ও অসহায়তা উপন্যাস প্রবাহিত হয়েছে । রাণুর ছোটভাই জিতু, ছাদে ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে নীচে পড়ে মারা যায়, এর শোকে তার মা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে মারা যান। এই সকল কারণে ক্রমে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছিল রাণু। এর পর একাকী চাকরি ঘরবাড়ি, কাজ-কর্ম নিয়ে সে বেঁচে রয়েছে এই যন্ত্রণাময় বর্তমানে। রাণুর মনে হয়, ''এ সব নিয়ে থাকতে থাকতে একসময় কখন যেন বুঝতে পারি আমি এর কোনটার মধ্যে নেই। কোনওটাই আমার নয়। আমি যেভাবে আছি এটা মিথ্যে। আমার থাকা না থাকার কোনও মানে হয় না। তখন আমার মরে যেতে ইচ্ছে হয়।''[৩৩] সকল কিছুর মধ্যে থেকেও এই উদাসীনতা, বিচ্যুতি, বিষণ্ণতাবোধ, স্বপ্ন হারানোর বেদনা রানুর মনে বেদনাবোধকে তীব্র করে তুলেছে।

বসুধা প্রায় নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে। তার বাবা মায়ের মৃত্যুর পর তার জীবনের সুর, আনন্দের অবসান ঘটেছে। বাবা মায়ের অপূর্ণ ইচ্ছের কথা তাকে বেদনা দেয়, চাকরি করে জীবনটাকে কোন রকমে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভ্যাসগত গতানুগতিকতায় আজ সে আচ্ছন্ন। বিবির জীবনের ব্যর্থতা তাকে পীড়া দেয়, রাণুর অন্তরের হাহাকার তাকে বিষণ্ন করে তোলে। শচীনবাবুর মৃত্যু তাকে জীবন ও মৃত্যুর রহস্যময়তায় আচ্ছন্ন করে। তবু তার মুখে শোনা যায় বেঁচে থাকার বাণী। যে বাঁচা নিতান্তই অভ্যাসগত, যেখানে ইচ্ছা অনিচ্ছার অনুরাগ ও অভিমান নেই। জীবনের উল্লাস নেই, প্রার্থনা নেই, অসাধ্য সাধনের ব্রত নেই। সে রাণুকে জানায়, ''মরে যাবার ইচ্ছেটা ভাল নয় রাণু। তোমার যেমন মনে হয় তুমি যে-ভাবে আছ-- এটা মিথ্যে আমারও মাঝে মাঝে সে রকম মনে হয়। হয়তো সব মানুষেরই হয়। আমাদের বেঁচে থাকাটা আর নিজেকে

বাঁচিয়ে রাখাটা বোধ হয় এক নয়। বেঁচে থাকাটা একটা প্রসেস; নিজে নিজেই গড়িয়ে যায় যতদিন পারে। কিন্তু নিজেকে বাঁচিয়ে রাখাটা অন্য জিনিস। আমরা ঠিক পারলাম না।''[৩৪]

বসুধা, রাণু, বিবি— এদের মনের যে অসুস্থতা তা আধুনিক জীবনেরই প্রভাব। দেশ, সমাজ, পরিবারের ভাঙন, রাজনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক অবক্ষয় মানুষের মনে শুধুই বেদনা সঞ্চারিত করে। অভ্যাসবশত মানুষ সুখের সন্ধানে ব্রতী হয়, কিন্তু সেই পথে সংঘাতের তীব্রতা তাকে হতাশ করে তোলে, নিঃসঙ্গতা, একাকিত্ব, মনের জগতে একাকী বিচরণ করার প্রবণতা মানুষকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন করে তুলেছে সমাজ ও পরিবারের গন্ডি থেকে। অসুখ আজ মানুষের দেহ-মন সর্বত্রই থাবা বসিয়েছে। বাইরে থেকে আজ মানুষকে বিচার করা সম্ভব নয়। ''কে সুখী, কে সুখী নয়, কার কোথায় সুখ, কোথায় অ-সুখ বাইরে থেকে বোঝা যায় না!''[৩৫] মনের ভিতর ঘটে চলা সেই ভাঙনের আভাস বিমল কর আমাদের দিয়েছেন তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে। মানুষের প্রবাহিত জীবনধারায় প্রতিনিয়ত ঘটে চলা বেদনাপর্ব মানুষের জীবনে স্বপ্নের ও ইচ্ছার কোরক গুলোকে মেরে ফেলে। মরীচিকার পিছনে ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত মানুষ অবশেষে নিজেকে সঁপে দেয় অনিবার্য পরিণতির হাতে, সেটাই তার নিয়তি, তার সাথে যুদ্ধ করা যেতে পারে, কিন্তু জেতার সম্ভাবনা থাকে না বললেই চলে। তারপর শুরু হয় হতাশা, বিষণ্নতা, বেদনাবোধ, যার প্রবাহ নিরন্তর।

'ইমলিগড়ের রূপকথা' (২০০৩) বিমল করের লেখা শেষ উপন্যাস। বিরাশি বছর বয়স্ক লেখক অত্যন্ত শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেও পূজা সংখ্যায় লেখার জন্য এই উপন্যাসের পরিকল্পনা করেন। উপন্যাসটির অনুলেখন করেন লেখকের পারিবারিক সূত্রে পরিচিত স্বপন সাহা। অসুস্থ লেখক বিছানায় শুয়ে শুয়ে গভীর নিবিষ্টতার মধ্য দিয়ে বলে যান, আর স্বপন বাবু উপন্যাসটির অনুলেখনের চেষ্টা করেন। বিমল করের সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে প্রায়শই দেখা যেত তিনি বার বার নিজের লেখাকে কেটে কুটে তাঁর মনোমত করে একটি কাঠামো দাঁড় করাতেন। রচনার ক্ষেত্রে তাঁর মধ্যে কোন আপোষ ছিল না, বা অত্যন্ত সাধারণ ভাবে বিষয়টিকে দেখতেন না, তাই গভীর নিবিষ্টতায় নিজের ভাবনার কথাগুলো নিজের মনোমত করে প্রকাশের প্রতি তাঁর দুর্বলতা লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু 'ইমলিগড়ের রূপকথা' উপন্যাসটিতে লেখক খুব বেশি পরিবর্তন করেননি। দীর্ঘদিন ধরে লালিত একটি স্বপ্নের যেন প্রকাশ ঘটল তাঁর এই উপন্যাসের মাধ্যমে। চিত্ররূপময় এই ছোট উপন্যাসটি যে লেখকের মনোরাজ্যে অত্যন্ত স্বচ্ছভাবে জাগ্রত ছিল তা কাহিনী ও প্রকাশ

ভঙ্গির মধ্য দিয়ে উপলব্ধ হয়। টুকরো টুকরো ছবির একটি অ্যালবামের মতো হয়ে উঠেছে উপন্যাসটি।

ইমলিগড় একটি পাহাড়ি জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল, যেখানে প্রতি শীতের সময় কিছু মানুষ হাওয়া বদল করতে আসে। অঞ্চলটির একসময় গুরুত্ব ছিল, মিলিটারিদের তাঁবু ছিল বিশ্বযুদ্ধের সময়, তখন থেকেই ছোট্ট এক চিলতে স্টেশনে ট্রেন এসে থামত। মিলিটারিরা চলে যাওয়ার পর প্রায় নির্জন এই স্থানে চাকুরিসূত্রে কিছু মানুষ থেকে গিয়েছিল, আর অল্পই স্থানীয় মানুষ। পাহাড়ি গঞ্জের মত এই স্থানে রয়েছে ডলবি সাহেবের একটি ভ্যারাইটি স্টোর, আর তার থেকে কিছু দূরে স্টেশনের কাছাকাছি নিলি মেমসাহেবের বাড়ি, এবং বাড়ি সংলগ্ন রেস্টুরেন্ট, যেখানে হাওয়া বদল করতে আসা মানুষেরা সকালের ব্রেকফাস্ট করতে পারে।

ছোট ইমলিগড়ে বেড়াতে আসা কয়েকটি পরিবারের বা দলের মধ্যে লেখক দেখালেন মানুষের ভাবনা-জগতের বৈচিত্র্য। এখানে জয়দীপ এবং দেবযানীর মত নববিবাহিত দম্পতি যেমন আছে, তেমনি রয়েছে কেদার সিনহা-যমুনা, কল্যাণ-শান্তিলতা, শীতলবাবু ও তাঁর স্ত্রী, জলধরবাবুর পরিবার, স্টেশন মাস্টার ও তাঁর স্ত্রী রমা, ইন্দ্রজিৎ ত্রিপাঠীর মত দার্শনিক অধ্যাপক, মোহিনী চাঁদের মত কাঠের ব্যবসায়ী, আবার এদের পাশাপাশি অনিমা, তার বোন ও তার মাসি সর্বাণী, এবং জগন্নাথ-ফটিক-হীরেণের মতো ছেলে ছোকরার দল। অত্যন্ত স্বাভাবিক হাসি মশ্‌করার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক আলোচনাও বিভিন্ন চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করেছে। হীরেণের বাঁশির সুরে যেমন মাদকতাময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি কিছু চরিত্রের সাংসারিক জীবনের অচরিতার্থতার যন্ত্রণাও ব্যাপ্ত হয়ে গেছে। কেদারবাবু ও তাঁর স্ত্রী, কিংবা কল্যাণবাবুদের আলোচনায় পারিবারিক জীবনের নানা যন্ত্রণার অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে। আবার হীরেণ-অনিমাদের আলোচনায় কমবয়সীদের অনুরাগ-বিরাগের স্বাভাবিক প্রকাশ লক্ষিত হয়। ডলবি সাহেব কিংবা মোহিনী চাঁদ নিজের ছেলেদের থেকে দূরে অবস্থান করে নিঃসঙ্গতা যেমন সহ্য করে নিয়েছেন তেমনি নিলি মেমসাহেব একাকী জীবনে অভ্যস্ত হয়ে জীবনের সময়গুলোকে কেবল খরচ করে চলেছেন।

উপন্যাসের কোণে কোণে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে জীবনের অচরিতার্থতার কথা ব্যক্তি জীবন ও সাংসারিক জীবনের নানা দুঃখ-ভোগের কথা। এর পাশাপাশি দেখা যায় ইন্দ্রজিৎ ত্রিপাঠীর বর্ণনায় তাঁর পরাবাস্তববাদী ভাবনার কথা। তাঁর 'আনসিন ওয়ার্ল্ড' সম্পর্কিত লেখা গ্রন্থে তিনি প্রকাশ

করেছিলেন, মানুষের জীবনের নানা অভিজ্ঞতার কথা, যা ব্যক্তি-মানুষের নিজস্ব, তার বিশ্লেষণ চলে না। প্রতিটি মানুষই স্বতন্ত্র জগতের অধিবাসী। তার মনোজগতে সে সম্পূর্ণ একা। তার সত্তার পরিবর্তনের পিছনে যে জাগতিক নিয়ম ও অনিয়ম কার্যকরী তাও সাধারণ মানুষের বোধগম্যতার বাইরে। ''আমি কেউ নই, আমার কোন আইডেনটিফিকেশন নেই। হঠাৎ উপনিষদের একটা কথা মনে পড়ল। তার অর্থ, তোমার কোন নিজস্ব সত্তা নেই। সত্তাই তোমাকে এক এক সময় এক এক রূপ দান করে। ...এটা বোঝা বড় কঠিন কিন্তু দুর্বোধ্য নয়। যেমন ধরো তুমি আজ যেমন আছ, আগামীকাল তোমার সত্তা তোমাকে অন্য মানুষও করে দিতে পারে। গাছপালা, প্রকৃতি, নদী এদের আজ আর কালকের কোন পার্থক্য ঘটে না, কিন্তু মানুষের ঘটে। তার চৈতন্য তাকে কোথায় কবে কোন রূপান্তরে একেবারে ভিন্ন করে তুলবে তুমি বলতে পারো না।''[৩৬]--ইন্দ্রজিতের এই কথার মধ্য দিয়ে মানব জীবন, তার সত্তার রহস্যময়তা ও গভীর জীবনদর্শন প্রকাশ পেয়েছে।

দুই দিন-রাতের ঘটনা নিয়ে লেখা উপন্যাসটিতে দ্বিতীয় দিন দেখা যায় আকস্মিকভাবে নিলি মেমসাহেব তার ঘরে মারা যান। খ্রীষ্টান হিসেবে তাঁকে খ্রীষ্ট ধর্মের নিয়ম অনুযায়ী সৎকারের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন। বেশ দূরের গ্রাম থেকে পাদরি সেদিন আসতে পারবেন না। জয়দীপ ডলবি সাহেবের মধ্যেও উদাসীনতা লক্ষ্য করে মর্মাহত হয়ে উঠল। কিন্তু সন্ধ্যা-রাতের গহন অন্ধকারের মধ্যে জয়দীপ ডলবিকে খুঁজে পেল নিলির মৃতদেহের সামনে।

ডলবির অতীতচারিতায় তখন ছিল নিলির সাথে তার ভালবাসা ও সন্তানের স্মৃতি, যে সন্তানের এক বছর বয়সে মৃত্যুর পর থেকে নিলি সম্পূর্ণ একা। ডলবি বিয়ে করলেও স্ত্রীর মৃত্যুর পর এবং ছেলের দূরে থাকার সুবাদে তিনিও নিঃসঙ্গভাবে জীবন কাটিয়েছেন। জয়দীপ নিলির ঘরে এক অন্য ডলবিকে খুঁজে পেল, যে স্মৃতিভারাতুর, বিনম্র চিত্ত এবং কিছুটা অসহায়। ডলবির আত্মকথনের মধ্য দিয়ে মানব জীবনের বিশেষ অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে, ''মানুষের দুঃখগুলো এইভাবে কোথাও না কোথাও লুকিয়ে থাকে। এগুলো বলা যায় না, প্রকাশ করা যায় না।''[৩৭] মানবের অন্তর্গূঢ় গোপনচারি অনুভব একান্তভাবে সেই মানুষটিরই, তা সে পৃথিবীর যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, তার পরিবর্তন হয় না --এই ভাবনা উপন্যাসে প্রকাশ পেয়েছে।

খ্রীষ্ট ধর্মের কথা এই উপন্যাসেও ব্যক্ত হয়েছে। নিলি মেমসাহেবের পাশাপাশি ডলবিও খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী মানুষ। ডলবিরা বিহারী হলেও এক সময় নিম্নবর্ণের মানুষদের খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী হওয়ার প্রবণতার সাথে সাথে ডলবির বাবাও ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম তাঁদেরকে সমাজে স্বীকৃতি

দিতে পেরেছিল, যা নিম্নবর্ণের মানুষ হিসেবে হিন্দুধর্মের কাছ থেকে তাঁরা পাননি। খ্রীষ্টধর্মের উদারতার প্রসঙ্গ নিলি কিংবা ডলবির জীবনাচরণে প্রকাশ পেয়েছে।

সাংসারিক জীবনের দুঃখ যন্ত্রণা, পরিবারতন্ত্রের ভাঙন, মানসিক অসুস্থতার প্রসঙ্গের পাশাপাশি এই উপন্যাসেও মৃত্যুর কথা ব্যক্ত হয়েছে। তবুও সেই মৃত্যু কিছুটা সহজ, স্বাভাবিকভাবে এসেছে। ভয়াবহতার পরিবেশ এখানে নেই, স্মৃতিচারিতা ও সম্মান জানানোর উদারতায় তা করুণ-মধুর। ছোট ছোট চিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক ব্যক্তি-মানবের, মানসিকতার যে প্রতিফলন এই উপন্যাসে প্রকাশ করে তুলছেন তা সত্যিই অসাধারণ। এই রচনায় তিনি দ্যোতিত করে তুলেছেন, আকাশে চাঁদের আলোর অনুপস্থিতিতে উজ্জ্বল তারার দীপ্তির মত মানুষের দুঃখময় অনুভূতিগুলোও মনের গভীর প্রকোষ্ঠে উজ্জ্বল হয়ে থাকে, --এই ভাবনা। লেখকের মৃত্যু-পূর্ব (মৃত্যু: ২৬শে আগষ্ট, ২০০৩) রচনা হিসেবে উপন্যাসটির বিশেষ মাত্রা পেতে পারে।

উৎস পরিচয়

১.'কিছু খড় আর কুটো : বিমল করের সঙ্গে কিছুক্ষণ'-- সাক্ষাৎকার-সুব্রত ঘোষ, 'বিমল করের উপন্যাস প্রসঙ্গ অসুখের উপমা' বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৬, পৃষ্ঠা-২০২

২. 'উড়োখই'(দ্বিতীয় পর্ব)--বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, জুলাই-১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৫৬

৩. 'ছোটমন'-'দেওয়াল'--বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী-২০০৩, পৃষ্ঠা-২১৬-২১৭

৪. তদেব, পৃষ্ঠা-২৭৯

৫. 'উড়োখই'(প্রথম পর্ব)--বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, সেপ্টেম্বর-২০০১, পৃষ্ঠা-২১৩

৬. 'উড়োখই'(দ্বিতীয় পর্ব)--বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, জুলাই-১৯৯৭, পৃষ্ঠা-২০

৭. 'খড়কুটো'--বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, সেপ্টেম্বর-১৯৯৪, পৃষ্ঠা-৪৩-৪৪

৮. তদেব, পৃষ্ঠা-১০২

৯. 'কালের প্রতিমা'-- অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাব, ২০০১, পৃষ্ঠা-২২৩

১০. 'আমার লেখা'-'গল্প সংগ্রহ'--বিমল কর, প্রকাশক--ব্রজকিশোর মণ্ডল,
প্রথম প্রকাশ- ১৩৮৭, .পৃষ্ঠা-২৭
১১. 'পূর্ণ অপূর্ণ'-'উপন্যাস সমগ্র'(২)--বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, সেপ্টেম্বর- ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-২১৯
১২. তদেব, পৃষ্ঠা-৪১৩
১৩. 'উড়োখই'(দ্বিতীয় পর্ব)--বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, জুলাই- ১৯৯৭, পৃষ্ঠা- ১৪০
১৪. 'যদুবংশ'-'উপন্যাস সমগ্র'(৩)--বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, সেপ্টেম্বর-২০০০, পৃষ্ঠা- ১৮৭
১৫. তদেব, পৃষ্ঠা-২৮৪
১৬. 'বিমল করের যদুবংশ'--বিমল কুমার মুখোপাধ্যায়,-তীব্র কুঠার, বইমেলা- ১৪১০, পৃষ্ঠা-৯৬
১৭. 'অসময়'--'উপন্যাস সমগ্র'(৫)--বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, সেপ্টেম্বর-২০০২, পৃষ্ঠা- ১২৩
১৮. তদেব, পৃষ্ঠা-২৭
১৯. 'বিমল করের অসময় : ক্রমশ নারীবাদ'-জহর সেন মজুমদার-তীব্র কুঠার, বইমেলা- ১৪১০, পৃষ্ঠা- ১৬০
২০. 'উড়োখই'(দ্বিতীয় পর্ব)--বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, জুলাই- ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৯২
২১. 'খোয়াই'-'উপন্যাস সমগ্র'(২)--বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, সেপ্টেম্বর- ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ১০১
২২. 'ভুবনেশ্বরী'--'উপন্যাস সমগ্র'(৩)--বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, সেপ্টেম্বর-২০০০, পৃষ্ঠা-৩৬২
২৩. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৭৯
২৪. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৮০
২৫. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৭৮
২৬. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৮২
২৭. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৮৪
২৮. 'নিমফুলের গন্ধ'-'উপন্যাস সমগ্র'(৫)--বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, সেপ্টেম্বর-২০০২, পৃষ্ঠা-৪৪৮
২৯. তদেব, পৃষ্ঠা-৪৮৯
৩০. তদেব, পৃষ্ঠা-৪৩৬
৩১. তদেব, পৃষ্ঠা-৪৭৮
৩২. 'বেদনা পর্ব'-'উপন্যাস সমগ্র'(৭)--বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, সেপ্টেম্বর-২০০৪, পৃষ্ঠা-৩৭৭
৩৩. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৫৫
৩৪. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৫৫
৩৫. তদেব, পৃষ্ঠা-২৮০
৩৬. 'ইমলিগড়ের রূপকথা'-- বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারি ২০০৪, পৃষ্ঠা-৬৮-৬৯
৩৭. তদেব পৃষ্ঠা-৮৯

-----o-----